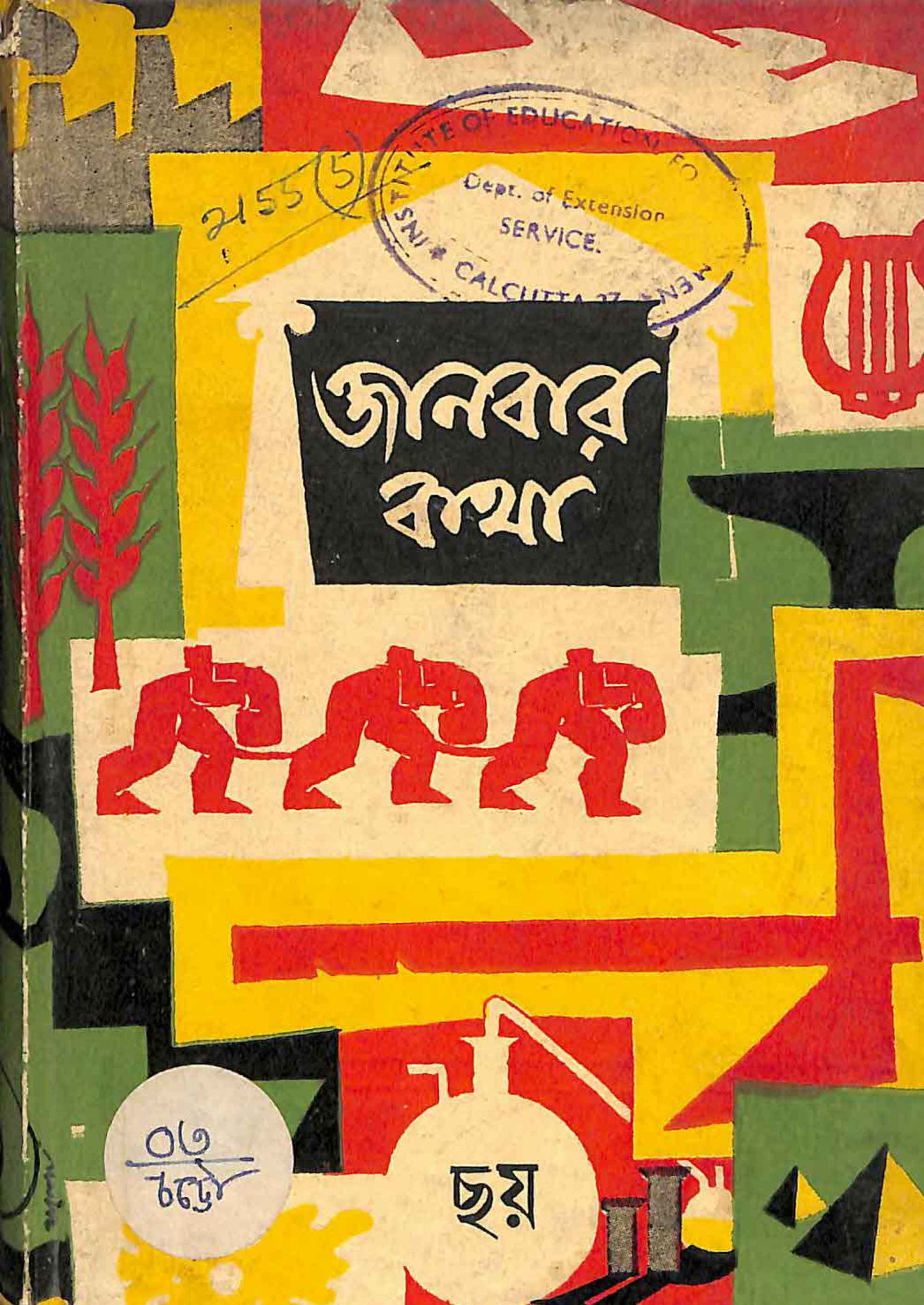

জানবার
কথা
ছয়

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

ঝাঙ্গার

১১-বি, চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা ২০

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৮/১, লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—১ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী, ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিশার্স

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে



পৃথিবী আর মানুষ

এ-বইতে বলবো পৃথিবীর কথা।

কিন্তু, মনে আছে তো, আমাদের 'জানবার কথা'র আসরে সবটুকু আলোচনাই মানুষকে ঘিরে, মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই পৃথিবীর কথার সঙ্গে সঙ্গেই উঠলো মানুষের কথাও।

শুধোলাম, পৃথিবীতে কতো মানুষ আছে?

হিসেব পাওয়া গেলো। ঢের মানুষ। প্রায় আড়াই শো কোটি।

কিন্তু সব মানুষের হাল তো সমান নয়। কোনো কোনো দেশে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার যেন সীমা নেই। পেটে খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, শীতের রাতে মাথা গোঁজবার মতো জায়গা নেই।

এমন কেন

একদল পণ্ডিতের কাছ থেকে শোনা গেলো, এর জন্যে পৃথিবীও দায়ী, মানুষও দায়ী। শুধোলাম পৃথিবী দায়ী হবে কেন ?

কেননা, ওই পণ্ডিতদের কাছ থেকে জবাব পাওয়া গেলো, পৃথিবীতে যে-পরিমাণ রসদের জোগান রয়েছে তাতে এতো লোকের পক্ষে কোনোমতে টায়ে-টুয়ে বাঁচবার চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। কৃপণ এই পৃথিবী,—এতো লোকের এতো রকম অভাব-অনটন না হয়ে আর উপায় কি ?

শুধোলাম, আর মানুষ দায়ী হলো কেন ?

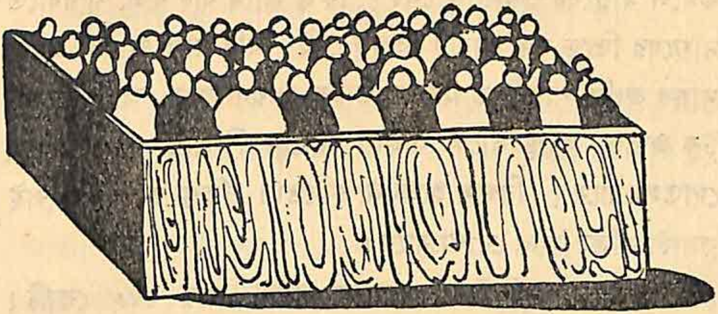
জবাব পাওয়া গেলো, মানুষ যে একেবারে বেহিসেবীর মতো হুড় হুড় করে সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে।

আমাদের কিন্তু কী রকম খটকা লাগলো। ঠিক করলাম, ভালো করে খতিয়ে হিসেব করতে হবে।

হিসেবপত্তর করতে গিয়ে দেখি, ও হরি! সবটাই বেমালুম ফাঁকির কথা। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে ঐশ্বর্যের অভাব এতোটুকুও নেই। বরং, পৃথিবীতে যে-পরিমাণ ঐশ্বর্য রয়েছে তা যদি ঠিকমতো মানুষের ভোগে আসে তাহলে সব মানুষেরই জীবন সুখে-শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

তা হচ্ছে না কেন ? তা কি হওয়া সত্যিই সম্ভব ? কোনো দেশে কি সত্যিই তা সম্ভবপর হয়েছে ?

'পৃথিবী' আর 'মানুষ' নিয়ে আমাদের এই বইটিতে তারই জবাব দেওয়া গেলো।



এক মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া আর এক মাইল উঁচু
একটা বাকসর মধ্যে পৃথিবীর সব মানুষ ধরে যেতে পারে!

পৃথিবীতে কতো মানুষ?

যে কোনোদিন বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলায় যদি কলকাতায় ধর্মতলা ষ্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে কিংবা দিল্লীর চাঁদনিচকে বা বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে যাও, দেখবে হাজার হাজার লোকের ভিড়—লম্বা ও বেঁটে, রোগা ও মোটা, ফর্সা ও কালো—কতো রকমের কতো বিচিত্র মানুষ! দেখে নিশ্চয়ই মনে হবে, কী ভিড় আমাদের এই শহরগুলোয়! তারপর যখন শুনবে কলকাতা, দিল্লী বা বোম্বাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভিড় পৃথিবীতে অন্যান্য অনেক শহরে, তখন হয়তো আমাদের এই পৃথিবীর কথা ভাবতে গেলেই ভিড়ের ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড় হবে।

আর এই ভিড়ের কথা তুলেই একদল লোক বলছেন, এরই দরুন পৃথিবীতে এতো অভাব এতো অনটন! মানুষের সংখ্যা না

কমলে মানুষের সুখশান্তি নেই! কিন্তু আমি যদি বলি, পৃথিবীতে মানুষের ভিড়ে ভয় পাবার কিছুই নেই—যদি বলি আমরা সমস্ত মানুষ জাতি পৃথিবীতে ঠিক ততোটুকু জায়গা জুড়ে আছি যতোটুকু জায়গা জুড়ে থাকে একটা ছোট্টো পিঁপড়ে একটা বড়ো দোতলা বাসে! বিশ্বাস হচ্ছে না হয়তো। কিন্তু হিসেব করলেই কথাটা সত্যি কিনা বোঝা যাবে।

বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৫০ কোটি। প্রত্যেকটি মানুষই যদি লম্বা হয় ছ ফুট, চওড়া হয় দেড় ফুট আর মোটা হয় এক ফুট তবে তাদের জন্যে সবশুদ্ধু কতোটা জায়গা লাগবে? এক মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া আর এক মাইল উঁচু একটা বাক্স বানিয়ে তাতে কি সমস্ত মানুষ জাতটাকে ভর্তি করে দেওয়া যায় না? হিসেব করলেই দেখবে, স্বচ্ছন্দে যায়।

ওই যে প্রায় ২৫০ কোটি মানুষ, তার মধ্যে কোন মহাদেশে কতো জন?

পৃথিবীর ও বিভিন্ন মহাদেশের লোকসংখ্যা

পুরো পৃথিবীর হিসেব : ১৯৩০ সালে ২০০ কোটি, ১৯৩৯ সালে ২১৯ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৪৯ সালে ২৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ।

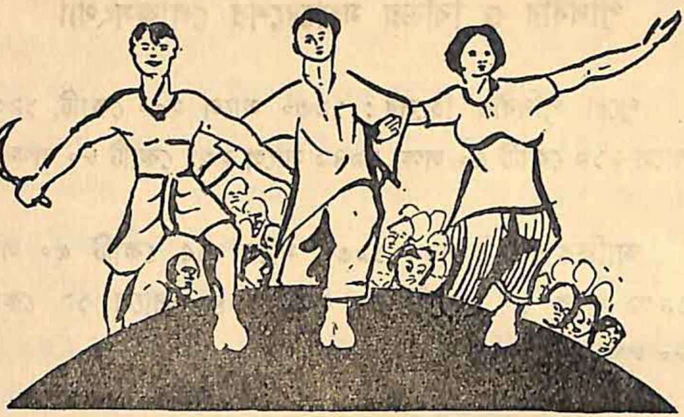
আফ্রিকার হিসেব : ১৯৩০ সালে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৩৯ সালে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৪৯ সালে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও কানাডার হিসেব ঃ ১৯৩০ সালে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ, ১৯৩৯ সালে ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ, ১৯৩৯ সালে ৩২ কোটি ১০ লক্ষ।

এশিয়ার হিসেব (সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যে-অংশ এশিয়ায় পড়ে তা বাদ দিয়ে) ঃ ১৯৩০ সালে ১০৬ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৩৯ সালে ১১৬ কোটি ২০ লক্ষ, ১৯৪৯ সালে ১২৫ কোটি ৪০ লক্ষ।

ইউরোপের হিসেব (সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যে-অংশ এশিয়ায় পড়ে তা ধরে) : ১৯৩০ সালে ৫৩ কোটি, ১৯৩৯ সালে ৫৭ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৪৯ সালে ৫৯ কোটি ৩০ লক্ষ।

ওশেনিয়ার (অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ) হিসেব : ১৯৩০ সালে ১০ কোটি, ১৯৩৯ সালে ১১ কোটি, ১৯৪৯ সালে ১২ কোটি।



এই তালিকাটি মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, আমরা যারা এশিয়া মহাদেশে বাস করি তারাই হলাম সমস্ত মানুষজাতির মধ্যে অর্ধেকের বেশি। এশিয়ার কোটি কোটি মানুষ এ-কথা ক্রমেই গভীরভাবে বুঝছে যে, যদি এশিয়ার সমস্ত দেশ স্বাধীন হয়, যদি এশিয়ার জনসাধারণ হাতে হাত মিলিয়ে নতুন জীবন গড়ে তবে সমস্ত মানুষজাতির পক্ষে তা হবে এক বিরাট পদক্ষেপ।

শুধু যে আমরা সমস্ত মানুষজাতির অর্ধেকের বেশি তাই নয়; এশিয়া মহাদেশেই মানুষের সব থেকে ঘন বসতি।

ধরো, আফ্রিকা কিংবা আমেরিকা। পৃথিবীর স্থলভূমির শতকরা ২২ ভাগ হলো আফ্রিকা মহাদেশ কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র শতকরা ৮ জন মানুষের সেখানে বাস। তেমনি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলিয়ে হয় পৃথিবীর স্থলভূমির শতকরা ৩১ ভাগ কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র শতকরা ১৩ জন লোকের সেখানে বাস।

পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৮ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ লোক জন্মগ্রহণ করছে ও ৫ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। কাজেই মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, বছরে শতকরা ১·২ করে পৃথিবীর লোক বাড়ছে।

এইবার আমাদের দেশের হিসেব দেখা যাক।

১৯৫১ সালের হিসেব অনুসারে আমাদের দেশের জনসংখ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া যায়: মোট জনসংখ্যা— ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৬ শো ২৪। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮ শো ৭ ও নারীর সংখ্যা ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার ৮ শো ১৭। এই হিসেব জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ও আসামের আদিবাসীদের সংখ্যা বাদ দিয়ে। ১৯৫০ সালে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং আসামের আদিবাসীদের সংখ্যা ৫৬ লক্ষ ছিলো বলে অনুমান করা হয়।

জন্মহার	হাজারে	২৬·৮	গ্রামের সংখ্যা : ৫৫৮০৮৯
মৃত্যুহার	”	১৬·০	শহরের সংখ্যা : ৩০১৮
শিশুমৃত্যু	”	১২২	

আমাদের দেশের সমগ্র মাপ : ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শো ১৪ বর্গমাইল।

ভারতবর্ষের আর পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তালিকা পরের দু পাতা ধরে দেওয়া হলো।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যা

প্রদেশের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	১৯৪১-এর জনসংখ্যা	১৯৫১ সালের জনসংখ্যা
১. আসাম	৫৪,০৮৪	৭৫,৯৩,০৩৭	৯১,২৯,৪৪২
২. বিহার	৭০,৩৬৮	৩,৬৫,৪৫,৫৭৫	৪,০২,১৮,৯১৬
৩. বোম্বাই	১১৫,৫৭০	২,৯৫,০৬,৯৬৮	৩,৫৯,৪৩,৫৫৯
৪. মধ্য প্রদেশ	১৩০,৩২৩	১,৯৬,৩১,৬১৫	২,১৩,২৭,৮৯৮
৫. মাদ্রাজ	১২৭,৭৬৮	৪,৯৮,৪৭,৫০৮	৫,৬৯,৫২,৩৩২
৬. উড়িষ্যা	৫৯,৮৬৯	১,৩৭,৬৭,৯৮৮	১,৪৬,৪৪,২৯৩
৭. পাঞ্জাব	৩৭,৪২৮	১,২৫,৯৩,৬২৮	১,২৬,৩৮,৬১১
৮. উত্তর প্রদেশ	১১২,৫২৩	৫,৬৫,১৬,৬২২	৬,৩২,৫৪,১১৮
৯. পশ্চিমবঙ্গ	২৯,৪৭৬	২,১৮,৩৭,২৯৫	২,৪৭,৮৬,৬৮৩
১০. হায়দ্রাবাদ	৮২,৩১৩	১,৬৩,৩৮,৫৩৪	১,৮৬,৫২,৯৬৪
১১. জম্মু ও কাশ্মীর	৮২,২৫৮	৪০,২১,৬১৬	—
১২ মধ্য ভারত	৪৬,৭১০	৭১,৫১,৫০২	৭৯,৪১,৬৪২
১৩. মহীশূর	২৯,৪৫৮	৭৩,২৯,১৪০	৯০,৭১,৬৭৮
১৪. পাতিয়ালা ও পেপসু	১০,০৯৯	৩৪,২৪,০৬০	৩৪,৬৮,৬৩২
১৫. রাজস্থান	১২৮,৪২৪	১,৩২,৮২,১০৫	১,৫২,৯৭,৯৭৯
১৬. সৌরাষ্ট্র	২১,০৬২	৩৪,৩০,৮৯২	৪১,৩৬,০০৫
১৭. ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন	৯,১৫৫	৭৪,৯২,৮৯৩	৯২,৬৫,১৫৭
১৮. আজমীঢ়	২,৪২৫	৫,৮৮,৯৬০	৬,৯২,৫০৬
১৯. ভূপাল	৬,৯২১	৭,৮৫,৩২২	৮,৩৮,১০৭
২০. বিলাসপুর	৪৫৩	১,১০,৩৩৬	১,২৭,৫৬৬
২১. কুর্গ	১,৫৯৩	১,৬৮,৭২৬	২,২৯,২৫৫

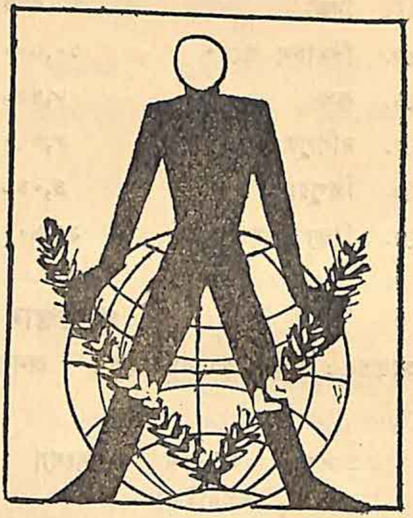
২২.	দিল্লী	৫৭৪	৯,১৭,৯৩৯	১৭,৪৩,৯৯২
২৩.	হিমাচল প্রদেশ	১০,৬০০	৯,২৫,৩৫৯	৯,৮৯,৪৩৭
২৪.	কচ্ছ	৮,৪৬১	৫,০০,৮০০	৫,৭৬,৮২৫
২৫.	মণিপুর	৮,৬২০	৫,১২,০৬৯	৫,৭৯,০৫৮
২৬.	ত্রিপুরা	৪,০৪৯	৫,১৩,০১০	৬,৪৯,৯৩০
২৭.	বিন্ধ্য প্রদেশ	২৪,৬০০	৩৩,৫৩,০১৯	৩৫,৭৭,৪৩১

পাকিস্তান

আয়তন : ৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : মোট ৭,৫৮,৪২,১৬৫
(১৯৫১ সালে)

প্রদেশ	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
পূর্ব পাকিস্তান	৫৪,৫০১	৪,২০,৬২,৬১০	২,২০,৩৯,০০০	২,০০,২৪,০০০
পাঞ্জাব ও বাহাওয়ালপুর	৬৩,১৩৪	২,০৬,৫১,১৪০	১,১০,৫৮,০০০	৯৫,৯৩,০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৬৪,২৫৬	৫৮,৯৯,৯০৫	৩১,১৩,০০০	২৭,৮৭,০০০
সিন্ধু প্রদেশ ও খয়েরপুর	৪৭,৫৬৯	৪৯,২৮,০৫৭	২৭,০৯,০০০	২২,১৯,০০০
বালুচিস্তান	১,৩৪,০০২	১১,৭৪,০৩৬	৬,৪৪,০০০	৫,৩০,০০০
করাচী ও আশপাশ	৫৬৬	১১,২৬,৪১৭	৬,৪৬,০০০	৪,৮০,০০০
মোট -	৩,৬৪,৭৩৭	৭,৫৮,৪২,১৬৫	৪,০২,০৯,০০০	৩,৫৬,৩৩,০০০





পৃথিবীতে আজই যতোটুকু আবাদযোগ্য জমি আছে তার সবটুকুতেই যদি ঠিকমতো ফসল ফলানো যায় তাহলে আরো তিনগুণ লোককে পেট ভরে খাওয়ানো সম্ভব।

আগেই বলেছি এখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৫০ কোটি। এই জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি লোকেরই অনেকদিন পেট ভরে খাবার জোটে না। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় বহু এলাকা আছে যেখানে অনাহার একটা চিরস্থায়ী ঘটনা। আমাদের দেশে তো দুর্ভিক্ষ প্রায়ই হচ্ছে। এমনকি আমেরিকার মতো দেশেও এক কোটির ওপর লোক তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না।

এই অনাহার ও দুঃখের জন্যে কি আমাদের এই পৃথিবী দায়ী? আমরা কি পরিশ্রম করে পৃথিবীর সমস্ত লোকের পেটভরে খাবার

মতো জিনিস উৎপাদন করতে পারি না? হিসেবে দেখা যায়, আজকের অবস্থাতেও, আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার না করেও, মানুষ ৭০০ কোটি অর্থাৎ বর্তমানের ৩ গুণ বেশি জনসংখ্যার বুভুক্ষা মেটাতে পারে—২৫০ কোটি তো কোন ছার।

যদি বিশ্বাস না হয় নিজেই হিসেব করে নাও না। একজন মানুষের উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান রাখতে হলে মাথা-প্রতি প্রায় ৭ বিঘে আবাদি জমির দরকার। আজকের দিনে পৃথিবীতে মাথা-পিছু আবাদি জমি আছে ৩ বিঘে। কিন্তু পৃথিবীতে অনাবাদি জমি রয়েছে প্রচুর। পৃথিবীতে যা জমি আছে তার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র জমিতে আবাদি ফসল জন্মায় এবং এই ১০ ভাগেরও মাত্র ৪ বা কিছু বেশি ভাগ জমিতে ফলে খাদ্য-ফসল। উপযুক্ত আবহাওয়া, মাটি ইত্যাদির কথা বিবেচনা করলেও পৃথিবীর কম-পক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে আবাদ করা যায়। তার ফলে আবাদের জমি হয়ে যায় তিনগুণ এবং মাথা-পিছু জমির পরিমাণ ৩ বিঘে না হয়ে হয় প্রায় ৯ বিঘে। প্রত্যেকেই তাহলে প্রচুর খাদ্য পেতে পারে এবং এখনকার থেকে অনেক বেশি লোককে পৃথিবী ভরণপোষণ করতে পারে।

এই যে হিসেব দিলাম তা হলো বর্তমানের উৎপাদনের হার-কেই ভিত্তি করে। বর্তমানে গড়পড়তা উৎপাদনের যে-হার, তার থেকে অন্তত ৪ গুণ বেশি উৎপাদন জমি থেকে হতে পারে; তার প্রমাণ দিয়েছে সোবিয়েত দেশের বিভিন্ন যৌথ খামার। তাহলে ভেবে দেখো, আরো কতো বেশি খাদ্য-ফসল আমরা আমাদের এই পৃথিবীতে ফলাতে পারি।



পৃথিবীতে এতো দুঃখ কেন ?

এই পর্যন্ত শুনে তোমার মনে হবে, এই যদি সত্যি হয় তবে এতো অভাব-অনটন কেন ? কেন পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না ? কেন মর্মান্তিক অভাব কোটি কোটি মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে ?

এই অভাব ও দুঃখের জন্যে দায়ী আমাদের পৃথিবী নয়— আমাদের কপালও নয়। এর জন্যে দায়ী আমরাই। এইজন্যে যে, যেভাবে আমাদের জীবনকে গড়লে আমরা সুখে ও আনন্দে বাস করতে পারি সেই পথে আমরা আজও সকলে এগুতে পারছি না। আজও পৃথিবীর ⅔ অংশে নানারকম শোষণ চলে। আজও বহুদেশে জনসাধারণের পরিশ্রমে পুষ্ট হয় মুষ্টিমেয় একদল আর জনসাধারণ বঞ্চিত হয় তাদের শ্রমের ফল থেকে।

পৃথিবীর সব দেশের অবস্থা সমান নয়। পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে এতো দুঃখ-দুর্দশা কেন ? তার কারণ কি এই যে, অনুন্নত দেশগুলির নিজস্ব সম্পদ বলে কিছু নেই—বা যা আছে তা নেহাত কম ? মোটেই নয়। যেমন ধরো, আমাদের দেশের কথা। বহুদিন ধরে আমরা খুবই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের নেহাতই পিছিয়ে-পড়া দশা। আর তাই এতো দুর্দশা। আমাদের দেশের জমিতে কি সোনার ফসল ফলে না ? আমাদের খনির গুহায় কি ঐশ্বর্যের অভাব নাকি ? মোটেই নয়। আর এমনও নয় যে আমরা হলাম মানুষ হিসেবে অধমের জাত—খাটবার শক্তি নেই, বুদ্ধিতে খাটো ধরনের।

আমরা জানি, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সত্যিই বিশাল। আমরা জানি, জ্ঞানগরিমায় আমরা এককালে ছিলাম পৃথিবীর সব-দেশের আগে। আমরা জানি, আমাদের দেশের মানুষ যে-রকম হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে পারে তা অন্যান্য দেশের মানুষের চেয়ে কম নয়।

তাহলে ? এতো সত্ত্বেও আমাদের দেশের এমন দুর্দশা কেন ?

কেননা, বিদেশীর শাসনে আমাদের দিন কেটেছে। আমাদের দেশের অতো সম্পদ, অতো ঐশ্বর্য তার বেশির ভাগটাই লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে বিদেশী শাসকেরা। তারা জোর-জবরদস্তি করে আমাদের দাবিয়ে রেখেছে। দেশের উন্নতি হতে দেয়নি। আমাদের শেখাতে চেয়েছে যে আমরা হলাম খাটো ধরনের, নিচু ধরনের মানুষ—তাই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক অধিকারটাও

আমাদের থাকবার কথা নয়।

ওই বিদেশী শাসক বলতে কারা? প্রধানতই ইংরেজরা। তা ছাড়া অবশ্য আমাদের দেশের এখানে-ওখানে আরো নানান জায়গায় আরো কয়েক রকম বিদেশী শাসকের ছোটো-খাটো ডেরা। ফরাসীদের ডেরা। ওলন্দাজদের ডেরা।

ইংরেজেরা কি শুধুই আমাদের দেশের ওপরই এই রকম শোষণ-শাসন চালিয়েছিলো নাকি? নিশ্চয়ই নয়। পৃথিবীর আরো নানান দেশে, নানান জাতির মানুষের ওপর তাদের এই রকম প্রভুত্ব। সেই সব দেশের মানুষের অবস্থাও আমাদেরি মতো।

ইংরেজেরা বড়াই করে বলতো, ইংরেজ সাম্রাজ্যের ওপর থেকে কখনো সূর্য ডোবে না। তার মানে? আসলে, পৃথিবীর এক-পিঠে যখন সূর্য ডোবে তখন আর-একপিঠে সূর্য ওঠে। পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ দু-পিঠ জুড়ে নানান দেশের ওপর ইংরেজদের শাসন-শোষণ। তাই সূর্য ডোবেনা ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ওপর থেকে।

তাহলে, কথাটা আসলে খুব গর্বের কথা নয়। কেননা, এর আসল মানে হচ্ছে, ইংরেজরা সারা পৃথিবী জুড়ে ডাকাতি করে চলেছে—লুঠ-তরাজ করছে অন্যান্য বহুদেশের সম্পদ, দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে, বহু দেশের সামনে উন্নতির পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে থেকেছে।

আর ফরাসীরা? ওলন্দাজেরা? তাদের সাম্রাজ্য অবশ্য ইংরেজদের মতো অতো বড়ো নয়। তবুও তাদের লুঠ-তরাজ, তাদের নির্মম শোষণ ইত্যাদির কাহিনীও ইংরেজদের চেয়ে কম লজ্জাকর নয়।

হালের পৃথিবীতে কিন্তু এদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছে মার্কিনেরা। মার্কিনদের কায়দাকানুন অবশ্য ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতিদের থেকে খানিকটা তফাত।

তাদের আসল জোরটা হলো টাকার জোর। এই টাকার জোরে তারা আজ পৃথিবীর অনেক দেশকে শাসনে রাখতে চায়, শোষণ করতে চায়।

যারা অন্যান্য দেশকে শোষণ করে, দাবিয়ে রাখে, উন্নত হতে দেয় না,—তারাই হলো সাম্রাজ্যবাদী।

তা হলে, পৃথিবীতে আজো যে এতো দুঃখ এতো দৈন্য, এতো লজ্জা, এতো অপমান—তার আসল কারণ হলো সাম্রাজ্যবাদ। পৃথিবীর উন্নতির পথে এই সাম্রাজ্যবাদই আজ সবচেয়ে বড়ো বাধা।

মানুষ কি এই বাধা কাটাতে পারে না? পারে।

পৃথিবীর এক বিরাট অংশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিন্ন করে সম্পূর্ণ-স্বাধীন জীবন গড়ে তুলছে। এই অংশ হলো সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোবিয়েত ইউনিয়ন, নয়া গণতন্ত্রের দেশ মহাচীন এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি—চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগারিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, আলবানিয়া, পূর্ব জার্মানীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এ ছাড়া উত্তর কোরিয়ার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি দেশের জনসাধারণ আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে চিরদিনের মতো সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত। যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম।

ভিয়েতনামে স্বাধীনতার সংগ্রাম যে-পর্যায়ে গিয়েছে অন্যান্য

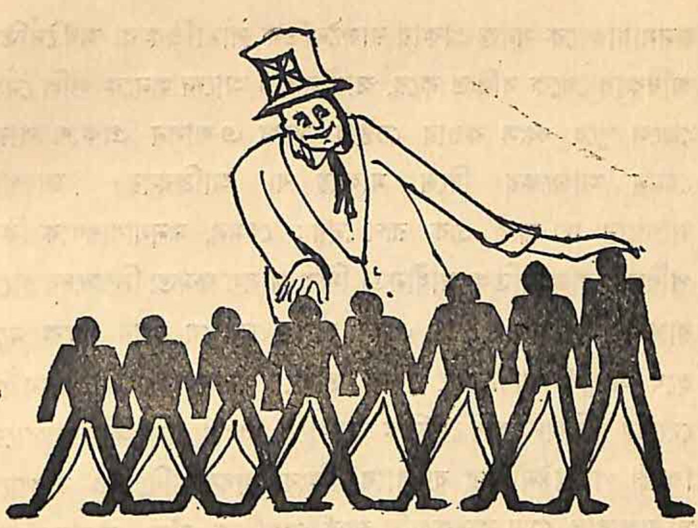
দেশে ঠিক সেই পর্যায়ে না গেলেও এ-কথা একেবারে ধ্রুব সত্য যে, যে-দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা শোষণ চলছে সেই দেশের মানুষই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে।

বর্তমান যুগ তাই সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম যুগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বলে যাদের নাম ছিলো মহাযুদ্ধের শেষে দেখা গেলো তাদের মধ্যে তিনটি নিজের সাম্রাজ্য হারিয়ে বসেছে : জার্মানি, জাপান ও ইটালি। বাকি যারা বেঁচে রইলো তাদের মধ্যে—ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ হয়ে গেলো ঢের দুর্বল। একমাত্র জোরালো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে রইলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কমজোর হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু এখনও রইলো সব থেকে বড়ো সাম্রাজ্যের অধিকারী।

তাই প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ একটু দেখে নেওয়া যাক।

*



পৃথিবীতে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

আজও পৃথিবীর স্থলভাগের এক-চতুর্থাংশ কিংবা লোকসংখ্যার হিসেবে প্রত্যেক চারজন মানুষের মধ্যে একজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে। হঠাৎ শুনলে কথাটা হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হবে! কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বলতে ১৯৪৭ সালের আগে ভারতবর্ষে যে-ধরনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ছিলো আমাদের মনে সেই ছবিই ভেসে ওঠে। কিন্তু আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ কোটি কোটি মানুষকে নানাভাবে শোষণ ও শাসন করে।

জায়গায় জায়গায় তা সোজাসুজি শোষিত দেশের

জনসাধারণকে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, স্বাধীনতার আন্দোলনকে গুলি মেরে জেলে পুরে ধ্বংস করার চেষ্টার মধ্যে এ-শাসন প্রকাশ পায়। যেমন আজকের দিনে মালয়ে বা আফ্রিকায়। জায়গায় জায়গায় তা আর এক রূপ নেয়: যেমন, জনসাধারণকে কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে আসল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখা। কোথাও তা এমন রূপও নেয় যে ওপর থেকে মনে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে দেশের বুনিয়াদী অর্থনৈতিক ব্যাপারে, কিংবা দেশরক্ষার ব্যাপারে, কিংবা পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে, কিংবা ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদ এমন কতকগুলি শর্তে দেশটিকে বেঁধে রেখেছে যার ফলে আপাত দৃষ্টিতে দেশটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে হলেও সেই দেশের স্বাধীনতা আংশিক এবং সেই দেশের জনসাধারণের জীবনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের করাল ছায়া।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে জানতে হলে এই সব কথা ভুললে চলবে না। কারণ পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই হলো সব থেকে ঝানু, সব থেকে ধূর্ত। আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টার তার ক্রটি নেই।

এই কথা মনে রাখলে এবং এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে আজকের হুনিয়ার দিকে তাকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ আমাদের চোখে পরিষ্কার হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে যে-সমস্ত দেশ তাদের তিন-ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) যে-সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদ সোজাসুজি, খোলাখুলি রাজত্ব চালাচ্ছে,—যেমন চালাচ্ছে আফ্রিকায়, মালয়ে, দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ গিয়ানায়।

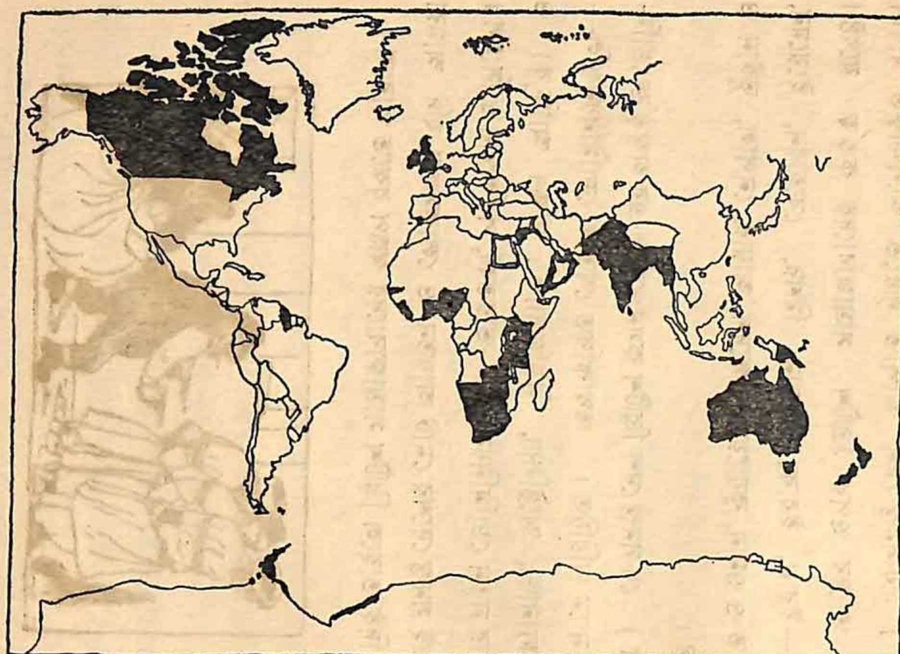
খ) যে-সমস্ত দেশ আপাত দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কিন্তু তাদের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব যথেষ্ট। যেমন—ইরান, ইরাক, জর্ডান, মিশর, বেহেরিন, ইয়েমেন, মুসকাত ও ওমান, কুয়ায়েত, ব্রহ্মদেশ, আয়ার, নেপাল, ভুটান ও সিকিম।

গ) যে-সমস্ত দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন নামে পরিচিত। তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ ডোমিনিয়নগুলি—যথা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড; দক্ষিণ আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন ডোমিনিয়নগুলি—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিংহল।

এই সমস্ত দেশের মোট আয়তন ও লোকসংখ্যা যদি আমরা যোগ দিই তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বুঝতে পারবো।



মধ্য এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার : মানচিত্রের কালো অংশ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (১৯৫০ সালের হিসেব)

	আয়তন (হাজার বর্গমাইলে)	জনসংখ্যা (হাজারে)	মোট জন সংখ্যার শতকরা	শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা (১০ লাখে)	অশ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা (১০ লাখে)
ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, আইল অফ্ ম্যান ও ইংলিশ চ্যানেলের দ্বীপপুঞ্জ)	৯৪	৫০৫১৯	৮·২	৫০·৫	——
"শ্বেতাঙ্গ" ডোমিনিয়নগুলি	৭২৪০	৩৬৩৭৭	৫·৯	২৬·২	১০
এশিয়ার ডোমিনিয়নগুলি	১৬০৫	৪৪৯৪৮২	৭২·৭	——	৪৪৯·৫
ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য	৩৮৮১	৮১৪৩৯	১৩·২	——	৮১·৪
মোট	১২৮২০	৬১৭৮১৭	১০০·০	৭৭	৫৪১

এর সঙ্গে যদি "খ" শ্রেণীর দেশগুলির হিসেব যোগ দাও তবে মোট দাঁড়ায় :

	আয়তন হাজার বর্গ মাইল	জনসংখ্যা হাজারে	শ্বেতাঙ্গ ১০ লাখে	অশ্বেতাঙ্গ ১০ লাখে
পূর্বোক্ত মোট	১২৮২০	৬১৭৮১৭	৭৭	৫৪১
"খ" শ্রেণীর দেশগুলি	১৬৮৭	৭৭০৩৭	৩	৭৪
মোট	১৪৫০৭	৬৯৪৮৫৪	৮০	৬১৫

পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তন ৫১৩৭৫ হাজার বর্গ-মাইল ও ১৯৫০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৩৭৮০০০০০০ ছিলো। কাজেই এখন হিসেব করলেই বুঝবে আমাদের পৃথিবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থান কোথায়।



কেনিয়ায় পুলিসী তাণ্ডব



উপনিবেশের বাগিচা-শ্রমিক

আর একটা কথাও ভুলো না যেন। যদিও ওপরে আমরা লিখেছি 'শ্বেতাঙ্গ ডোমিনিয়ন' তার মানে কিন্তু এই নয় যে, এই দেশগুলিতে শুধু শ্বেতাঙ্গরাই থাকে। যেমন ধরো, দক্ষিণ-আফ্রিকার ডোমিনিয়ন। ১৯৪৬ সালের হিসেব অনুসারে এই দেশে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ছিলো ২৩৭২৬৯০ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ছিল ৯০৪৫৬৫৯। তেমনি নিউজিল্যাণ্ডে ১১৬০০০ মাওয়ারী জাতির বাস। অষ্ট্রেলিয়ার শাসনকর্তারা সে-দেশের আদি-বাসীদের গণনাই করে না, কাজেই তাদের সংখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিসেব নিলে দেখা যায় যে, কোটি কোটি মানুষের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজও বিস্তৃত। তার মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা আট-জনে একজন—অর্থাৎ দুঃস্থ নিপীড়িত ঔপনিবেশিক জনসাধারণ আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত জনসংখ্যার ৮ ভাগের ৭ ভাগ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একদিন গর্ব করতো : দেখো কতবড় সাম্রাজ্য আমাদের যে সেখানে কখনও সূর্য অস্ত যায় না। আজ তাদের অনেক বিষদাঁত ভেঙে গেছে কিন্তু আজও তাদের চিরদিনের মতো নিঃশেষ করে দেওয়া যায়নি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন আমরা দেখলাম। এইবার বুঝতে হবে এই সাম্রাজ্যের অর্থ কী ? এই বিরাট সাম্রাজ্য থেকে লাভ-বান হচ্ছে কারা আর কাদের স্বার্থে এই সাম্রাজ্য চালানো হচ্ছে আপ্রাণ চেষ্টায় ? কারণ সাম্রাজ্য চালানো সোজা কথা নয়। আজকের পৃথিবীতে কোনো দেশই, কোনো জাতিই পরাধীনতা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে চায় না। তাই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উপনিবেশের জনসাধারণের নিয়ত সংগ্রাম চলে।

কাদের স্বার্থে চলছে এই সাম্রাজ্য? অনেকের ধারণা, সাম্রাজ্য-বাদী দেশের সব মানুষই সাম্রাজ্যবাদী লুঠের বখরা পেয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। আসলে, তা সত্যি নয়। সাম্রাজ্যবাদ থেকে আসল লাভটা মাত্র মুষ্টিমেয় লোকই ভোগ করে ; সাম্রাজ্যবাদী দেশেরই বাকি মানুষের অবস্থা খুব বেশি হিংসে করবার মতো নয়।

তাহলে, অতো হাঙ্গামা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে চালানো হচ্ছে তা কার স্বার্থে ? নমুনা হিসাবে নেওয়া যাক উত্তর রোডেসিয়া—একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। উত্তর রোডেসিয়ায় প্রধানত তামা উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত উৎপাদনই রপ্তানি হয়। ১৯৩৭ সালে এই সমস্ত উৎপন্ন তামা বিক্রি করে মোট আয় দাঁড়ায় প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এখন দেখা যাক,

বিক্রি করে যে-টাকাটা হলো সেটা পেলো কারা। এই ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭ কোটি টাকা লভ্যাংশ হিসাবে দেওয়া হলো এমন একটি কোম্পানির বিভিন্ন অংশিদারদের, যাদের কেউই উত্তর রোডেসিয়ার বাসিন্দা নয়। ৭০ লক্ষ টাকা একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে স্বত্বাধিকার হিসেবে দেওয়া হলো। এই কোম্পানিটির নাম ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানি। এই কোম্পানিটি তামার ব্যবসার ব্যাপারে কোনোই কাজ করে না। কিন্তু তবু এই কোম্পানিকে ঐ বিরাট টাকা স্বত্বাধিকার হিসেবে দিতে হয় তার কারণ ১৮৯৭ সালে এই কোম্পানিটি নাকি বারোটসের রাজা লেয়োনিকার সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলো। সে-চুক্তির ফলে এই দেশের সমস্ত খনি পদার্থ এই কোম্পানির সম্পত্তি। এই ভিত্তিতে উত্তর রেডসিয়ার তামার শিল্পের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব করা যেতে পারে।

আয়—	ব্যয়—
তামা বেচে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	লভ্যাংশ ৭ কোটি টাকা
	স্বত্বাধিকার বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা
	আয়কর ৯৮ লক্ষ টাকা
	১৬৯০ জন ইউরোপীয় কর্মচারীদের মাহিনা ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা
	১৭০০০ জন আফ্রিকান কর্মচারিদের মাহিনা : ৩৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা

	অন্যান্য সমস্ত খরচ যথা— গুদাম, যানবাহন, বীমা ইত্যাদি ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা
১৬ কোটি ৮০ লক্ষ	১৬ কোটি ৮০ লক্ষ

এই হিসেব দেখলেই বুঝবে যে, আফ্রিকান শ্রমিকরা গড়ে মাসে ১৭৲ টাকা আন্দাজ রোজগার করে আর এরই পাশাপাশি ভেবে দেখো ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার লভ্যাংশ ও স্বত্বাধিকার। তাহলেই বুঝবে অতিরিক্ত মুনাফার কী ভীষণ পরিমাণ।

এখন উত্তর রোডেসিয়া-বাসী আফ্রিকানরা যদি বলে যে, আমাদের শ্রমে তৈরি এই তামা আর আমাদের দেশের মাটিতেই তা পাওয়া যায়। কাজেই আমরা প্রতি বৎসর ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দেশের বাইরে বিদেশীর দিকে যেতে দেবো না। কিংবা যদি বলে আমাদের মাইনে ইউরোপীয়দের সমান-সমান করতে হবে। কিংবা যদি বলে, আমরা একটা দেশী কোম্পানি করবো তামা খনি থেকে তুলে বিক্রি করার জন্যে এবং তার জন্যে আমাদের এই দেশী কোম্পানিকে বিশেষ কতোগুলি সুবিধা দিতে হবে। তাহলে? ব্রিটিশ সরকার তাদের ওপর শাসনের দণ্ড নামাবে: সৈন্য পাঠাবে, পুলিশ পাঠাবে, দরকার হলে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলবে, জ্বলন্ত পেট্রোল ছড়িয়ে গ্রাম খেত পুড়িয়ে দেবে। এই হলো সাম্রাজ্যবাদ। বড়ো পুঁজিপতিদের স্বার্থই এর স্বার্থ। বড়ো পুঁজিপতি টাকাপয়সার রাঘব-বোয়ালদের কথাবার্তায় এ চলে।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। নাইজিরিয়ার টিন-খনিজ শিল্পের উদাহরণ :

টিন রপ্তানি করে ১৯৩৭ সালে উপার্জন হয় ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

এর থেকে মোট লাভ হয়—১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। মোট মজুরি আফ্রিকানদের—৪৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। প্রত্যেক বছর গড়ে কাজ করে ৩৬১৪২ আফ্রিকান।

এই হিসেব দেখলেই বুঝবে যে প্রত্যেকটি আফ্রিকান টিন-মজুর মাথাপিছু বছরে প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের টিন তৈরি করেছিলো আর তার বিনিময়ে পেয়েছিলো ১৩০ টাকা তার মজুরি হিসেবে। অর্থাৎ যে-মূল্য সে উৎপাদন করেছিলো তার প্রায় সাতভাগের এক ভাগ।

এই সব পুঁজিপতিরা শোষণ করে, উপনিবেশের জনসাধারণকে বঞ্চিত করে, কোটি-কোটি টাকা বছরের পর বছর লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কী? আসল কথা হলো, এই পুঁজিপতিরা তাদের নিজ নিজ দেশে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে, বিভিন্ন খবরের কাগজকে নিজেদের কবলে রেখে ও নানা অন্য উপায়ে এরা নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব করে। তাই যখনই এদের স্বার্থে আঘাত লাগে, যখনই এদের মুনাফায় টান পড়ে, তখনই এরা রাষ্ট্রের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার কাজে লাগিয়ে দেয়।

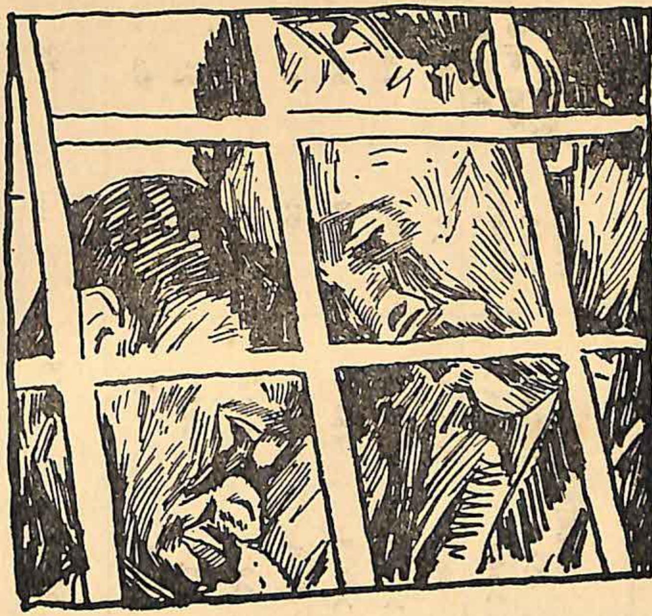
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সৈন্যসামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র না পেলে এরা

উপনিবেশের জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। তাই এদের অস্তিত্বই নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ওপর। তবে এরা সোজা-সুজি ও খোলাখুলি কাজ করে না। পেছন থেকে কলকাঠি টিপে, রাষ্ট্রকে ও সরকারকে দিয়ে নিজেদের কাজ কর্ম করিয়ে নেয় আর নিজ দেশের জনসাধারণের চোখে সব কিছু এমনভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করে যেন সমগ্র জাতীয় স্বার্থেই এরা এই সব সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার কাজ করছে।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কয়েকঘর এই সব পুঁজিপতি সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক-একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক, কল-কারখানা সব কিছু এরা আয়ত্ত করেছে আর দেশের ছোটো, বড়ো বা মাঝারি ব্যবসাদার কল-কারখানার মালিকদের নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করেছে।

এদের মধ্যে সবথেকে বড়ো পুঁজিপতিরা একচেটিয়া মালিকানা করে এবং তাদের প্রতিপত্তি স্বদেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে আছে। যেমন, ইংল্যাণ্ডের ইউনিলিভার কোম্পানি বা ইম্পিরিয়াল কেমি-কাল কোম্পানি।

এই বড়ো বড়ো পুঁজিপতি একচেটিয়া মালিকানা করে যে-সব কোম্পানি, তাদের ক্ষমতা যে কী পরিমাণ তার প্রমাণ পাবে যদি বলি যে একটা উপনিবেশের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন—অর্থাৎ কী ফসল ফলবে, কী কল চলবে, কতো ফসল ফলানো হবে, কতো কল চালানো হবে—এ সমস্ত প্রত্যেকটি বিষয় ঠিক হয় একটি বিদেশী কোম্পানির ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায়। বিশ্বাস করা কঠিন



হলেও কথাটা কিন্তু সত্যি কথা—এবং তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ নাইজিরিয়া দেশ, যে-দেশের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই নাইজিরিয়ার সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইন্‌ডাস্‌ট্রির একটি শাখার হাতে। নাম তার ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানি।

আজকের দিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পেছনে রয়েছে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল, ইউনিলিভার প্রমুখ বিরাট বিরাট কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতি কোম্পানি। দেশদেশান্তরে এদের জাল ছড়ানো। কোটি কোটি মানুষকে এরা শোষণ করছে। নিচে একটি তালিকা দিলাম। তা দেখে ইংল্যাণ্ডের এই রকম কয়েকটি বড়ো বড়ো একচেটিয়া পুঁজিপতি কোম্পানির কিছু পরিচয় পাবে। দেখবে কী বিরাট তাদের শোষণের ঘটা।

সাম্রাজ্যবাদী একচেটীয়া কোম্পানি ও তাদের মুনাফা

কোম্পানির নাম	১৯৫১ সালের পুঁজির পরিমাণ (১০ লক্ষ পাউণ্ডে হিসেব)	মোট লাভ (১০ লক্ষ পাউণ্ডে)		লভ্যাংশ ১৯৫১ (শতকরা)	পুঁজির তুলনায় শতকরা লাভ কতো ?
		১৯৫০	১৯৫১		
১। ইউনিলিভার	১৮৮·৫	৬৬·০	৭০·৮	১৩ ৫	৩৮
২। অ্যাঙলো-ইরানিয়ান	১৩৬·০	১১৫·৭	৭৫·৯	৩০	৫৬
৩। রয়াল ডাচ্ সেল	৫৫০·৮	১৯০·৪	২৪৯·৫	১৫	৪৪
৪। ইম্পিরিয়াল টোবাকো	৯৭·০	২৭·৮	৩০·২	৩২	৩১
৫। পি এণ্ড ও কোম্পানি	৮৭·৯	১৫·২	২০·০	১৬	২৩
৬। ডানলপ রবার	৪৫·১	১৭·৮	১৮·২	১৭·৫	৪০
৭। টেট অ্যাণ্ড লায়াল	৯·৭	৩·১	৩·৮	২০	৩৯
৭টি একচেটিয়া পুঁজিপতির মালিকানার মোট হিসেব	১১১৫·০ (অর্থাৎ ১৪৪৯·৫ কোটি টাকা)	৪৩৬·০	৪৬৮·৪	....	৪২

যে সমস্ত কোম্পানি উপনিবেশসমূহে কাজ করে (দশ লক্ষ পাউণ্ডে হিসেব)

	১৯৫১ সালের পুঁজি	১৯৫১-র লাভ	১৯৫০-র লাভ	পুঁজির অনুপাতে শতকরা লাভ
৮৯টি কোম্পানি সোনার খনির মালিক	২৪৪·০	৫১·০	৬৮·০	২৮
৯৫টি টিন, তামা প্রভৃতি খনির মালিক	১০৯·০	৩৫·০	৫৯·০	৫৪
১৩টি নানাপ্রকার খনির মালিক	৭৭·০	২০·০	২৭·০	৩৫
১৮টি তেল কোম্পানি	৩৪৫·০	১৪৬·০	২২৫·০	৬৫
৪০১টি রবার কোম্পানি	১০২·০	১২·০	৩৮·০	৩৭
২০১টি চা কোম্পানি	৫৩·০	১৩·০	২১·০	৪০
উপনিবেশসমূহে কাজ করে এরূপ ৮১৭টি কোম্পানির মোট	৯৩০·০	২৭৭·০	৪৩৮·০	৪৭

যে সমস্ত কোম্পানি উপনিবেশসমূহে কাজ করে না

২৯৭০টি কোম্পানি	৪২২৭	১১৫৪	১৪৩৭	৩৪

তালিকা দুটি একটু ভালো করে দেখলে অনেক কিছুই চোখে পড়বে। যেমন ধরো, যে সাতটি একচেটিয়া কোম্পানির মুনাফার হিসেব দেখা যাচ্ছে তা থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? প্রথমত, এই সাতটি কোম্পানি মিলে এক বছরে যে-লাভ লুটেছে তার অঙ্কটা হলো আমাদের দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫ বছরে যা টাকা ব্যয় করা হবে তার প্রায় তিনভাগের একভাগ। যে-সব কোম্পানি উপনিবেশে টাকা খাটায় না তাদের শতকরা লাভ ৩৪ আর যারা খাটায় তাদের শতকরা লাভ ৪৭। এর মানে কী? এর মানে একমাত্র এই যে, উপনিবেশের জনসাধারণকে অনেক বেশি শোষণ করার ফলে লাভের অঙ্ক বেড়ে গেছে। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ সরকার কর ইত্যাদি বাবদ এই লাভের কিছু অংশ নিজের তহবিলে নেয় এ-কথা সত্য; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকার নিজের বখরাটুকু নিলে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে একচেটিয়া মুনাফাকারীরা তাদের শোষণে কোনো বাধা পেলো।

এই হলো উপনিবেশগুলিতে শোষণের রূপ। এবং এ যে কী ভয়ঙ্কর, তার একটি প্রমাণ দেখো: ১৯৪৯ সালের হিসেবে দেখা গেছে উত্তর রোডেসিয়ার জাতীয় আয়ের শতকরা ২৭ ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার শতকরা ১৭ ভাগ এবং ইরানের শতকরা ১৩ ভাগ বিদেশে পাঠাতে হয়েছিলো বিদেশী পুঁজির মুনাফা ও সুদ হিসেবে।

এতোক্ষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের কথা আলোচনা

হয়েছে। এবার আমাদের দেশের অবস্থার দিকে তাকানো যাক। অনেকে বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এককালে ভারতবর্ষকেই তার সাম্রাজ্যের মধ্যমণি বলতো বটে, কিন্তু আজ তারা ভারত ছেড়েছে। এ-কথা কি সম্পূর্ণ সত্যি ? না, এ-কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। এ-কথা সত্যি যে, ১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সে-শাসন আর নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আজও ভীষণভাবে চলেছে।

১৯৪৮ সালের হিসেবে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রায় ১০৪৬ কোটি টাকা বিদেশী পুঁজি ছিলো। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি : প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা। এবং তারই পরে ছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি। এই পুঁজির সুদ হিসেবে এবং মুনাফার খাতে ভারতবর্ষকে বছরে ১১০ কোটি টাকার বেশি বিদেশে পাঠাতে হয়। ১৯৪৮ সালের পরে ভারতবর্ষে বিদেশী পুঁজি বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ শুধু এইভাবেই নয়, ভারতবর্ষকে আরও নানা ভাবে শোষণ করেছে। যেমন ধরো, ভারতবর্ষের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে-দেনা করেছিলো সে-দেনার অঙ্ক ছিলো প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। সে-টাকার অর্ধেকের বেশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি দিতে অস্বীকার করেছে। আমাদের অর্থ-নৈতিক জীবনের ওপর বিদেশী পুঁজির—এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ পুঁজির—কর্তৃত্ব কতোখানি তা বোঝা যায় যদি আমরা দেখি যে আমাদের বিভিন্ন শিল্পগুলিতে যতো টাকা খাটছে তার কতো অংশ বিদেশী পুজি। কয়েকটি বড়ো কোম্পানির হিসেব নিচে দেখো।

শিল্প	(শতকরা) বিদেশী পুঁজির ভাগ মোট টাকার তুলনায়
১। পেট্রলিয়াম	৯৭
২। রবার শিল্প	৯৩
৩। ছোটো রেল	৯০
৪। দেশলাই	৯০
৫। পাট	৮৯
৬। চা	৮৬
৭। কয়লা ছাড়া অন্য খনি	৭৩
৮। কয়লা	৬২
৯। রবার খেত	৫৪
১০। ব্যাঙ্ক ইত্যাদি	৪৬
১১। বৈদ্যুতিক শিল্প	৪৩
১২। কফি	৩৭
১৩। এঞ্জিনিয়ারিং	৩৩
১৪। খাদ্য	৩২
১৫। কাগজ	২৮
১৬। চিনি	২৪
১৭। বস্ত্র	২১
১৮। সিমেণ্ট	৫

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তো চলেছেই ; তার ওপর আমাদের ঘাড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এসেছে। আমাদের দেশে মার্কিন পুঁজি ব্রিটিশ পুঁজির তুলনায় কম বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষেও বেশ কোণঠাসা করে ফেলেছে। ভারতবর্ষের বাজারে আজ মার্কিন প্রতাপ বেড়ে চলেছে।

কথাটা যে সত্যি তা বুঝবে নিচে ভারতের আমদানির হিসেবটা দেখলেই :

ভারতের আমদানি

(১০ লক্ষ টাকার হিসেবে)

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১
ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে	১৫৩০	১২২৭
মার্কিন দেশ থেকে	১০৮৭	১৫৫৮
বিভিন্ন দেশ থেকে মোট আমদানি	৫৪২৯	৫৬৫৫
মোট আমদানির শতকরা ভাগ		
ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র	২৮·২	২১·৭
মার্কিন দেশ	২০·০	২৭·৬

১৯৫১ সালে ভারত সরকার মার্কিন ও ইংরাজ তেল কোম্পানি দুটির সঙ্গে যে চুক্তি করেন সেই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষে মার্কিন ও ব্রিটিশ পুঁজি আরও কায়েমী হয়ে বসার সুযোগ পেয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন ষ্ট্যানডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি ও ইংরেজ কোম্পানি বর্মা শেল যে তেল-সংশোধনের-কারখানা ভারতবর্ষে করবে সে গুলির কর্তৃত্বে ভারতবাসী কোনো প্রকার

ক্ষমতা পাবে না। তাছাড়া এই বিদেশী কোম্পানিগুলি যতো ইচ্ছা লাভ ও সুদ দেশের বাইরে পাঠাতে পারবে। মার্কিনী ষ্ট্যানডার্ড ভ্যাকুয়াম ১৫ কোটি টাকার ওপর পুঁজি ভারতে খাটাবে। বর্মাশেল কোম্পানি খাটাবে ২০ কোটি টাকার ওপর।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার মার্কিন সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করেন যার নাম চারদফা চুক্তি। ১৯৫২ সালে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার নাম, 'ভারত-মার্কিন টেক্‌নিক্যাল সহযোগিতা তহবিল'। এই চুক্তি অনুসারে ১৫০ কোটি মার্কিনী পুঁজি ভারতবর্ষে আসবে ৫ বছরের মধ্যে। এবং তার মধ্যে ৯০ কোটি টাকা এ পর্যন্ত এসেছে।

এই হিসেব থেকেই বোঝা যায় যে বিদেশী এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ পুজির শোষণ থেকে ভারতবর্ষ আজও মুক্ত নয় বরং তার শোষণ আরও বাড়ছে।



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ : মালয়



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ : কেনিয়া



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ : আফ্রিকা



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ : মালয়



মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

আমরা অনেকে অনেকরকম ক্লাবের কথাই জানি। কিন্তু এমন একটা ক্লাবের কথা আজ তোমাদের বলবো যা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হবে।

এই ক্লাবটির নাম "বিলিয়ন ডলার ক্লাব"। ডলার শব্দ যখন আছে, তখন বুঝতেই পারছো যে ক্লাবটি মার্কিন দেশের। এই

ক্লাবটির উদ্দেশ্য কী? কারাই বা এর সভ্য? নামটাই বা অমন কেন?

প্রথমে ধরা যাক এই নামটার কথাই।

'মিলিয়ন' কথাটার মানে হলো ১০ লক্ষ। 'বিলিয়ন' কথাটাও এই 'মিলিয়ন' পরিবারের: ১০ লক্ষের পেছনে যদি আরও তিনটে শূন্য লাগিয়ে দাও তাহলে দাঁড়ায় এক 'বিলিয়ন'। অর্থাৎ দাঁড়ালো এই ১০০০০০০০০০, কিংবা আমাদের হিসেবে ১০০ কোটি। প্রথম কথাটার মানে পাওয়া গেলো। এখন ধরা যাক ডলার শব্দটা। যদি কোনো বইয়ের দোকানে বই কিনতে যাও আর যদি বইটি মার্কিনদেশে ছাপা হয় আর যদি তার দাম লেখা থাকে এক ডলার তবে বইয়ের দোকানের ভদ্রলোক তোমার কাছ থেকে ৫ টাকা চাইবেন। যদিও বর্তমানে টাকা-ডলারের পারস্পরিক দামের থেকে এটা সামান্য বেশি, তবু একটা আন্দাজ আমরা পাচ্ছি।

তা হলে, কথাটার বাঙলা মানে দাঁড়ালো ৫০০ কোটি-পতিদের ক্লাব। অর্থাৎ যারা দেখাতে পারবে যে তাদের পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি অন্তত ৫০০ কোটি তারাই এই ক্লাবের সভ্য হতে পারবে। এখন বুঝে দেখো ব্যাপারটা: ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি না হলে এই ক্লাবের সভ্য হওয়া যায় না।

হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, মার্কিন দেশেই বা কজন আছে এতো টাকাপয়সাওয়ালা? এ বছরের প্রথমের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৮টি বড়ো বড়ো কোম্পানি মার্কিন দেশে রয়েছে যারা এই ক্লাবের সভ্য হতে পারে।

বছরখানেক আগে এই ক্লাবের সভ্য ছিলো ৬৬টি। এখন দাঁড়িয়েছে ৬৮। অর্থাৎ এক বছরে ২ জন বেড়েছে। কারা এই নতুন সভ্য? এক হলো, ফিলিপস্ পেট্রলিয়াম কোম্পানি ও দুই হলো, কনেকটিকাট মিউচুয়াল লাইফ অ্যাণ্ড জেনারেল মোটর অ্যাকসেপ্‌টেন্স কোম্পানি। এই বছর একজন প্রাক্তন সভ্যের সভ্যপদ নিয়ে একটু টানাটানি চলেছে। নাম তার ইনটারন্যাশানাল হারভেস্টার কোম্পানি। এ-বছর ইণ্টারন্যাশানাল হারভেস্টার-এর সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৮৬ কোটি টাকা।

এই ৬৮টি কোম্পানির মোট বিষয়-সম্পত্তির হিসেব দাঁড়িয়েছে ৯২৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কিনা, আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যা মোট টাকা খরচ ধার্য হয়েছে তার প্রায় ৫০ গুণ বেশি।

যুদ্ধের বাজার যে এই ৫০০-কোটি-পতিদের পক্ষে কতো সুখের তার আন্দাজ পাওয়া যায় একটিমাত্র ঘটনা থেকে: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মার্কিনী ৫০০-কোটি-পতিদের সংখ্যা ছিলো ৩২ আর এই যুদ্ধের বাজারে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে তা দাঁড়িয়েছে ৬৮। তা হলেই বুঝতে পারছো যে, মার্কিন কোটিপতিরা ১০০ বছর ধরে যা লাভ করেছে তার প্রায় সমান লাভ করেছে মাত্র ১৪ বছরের যুদ্ধের সময়।

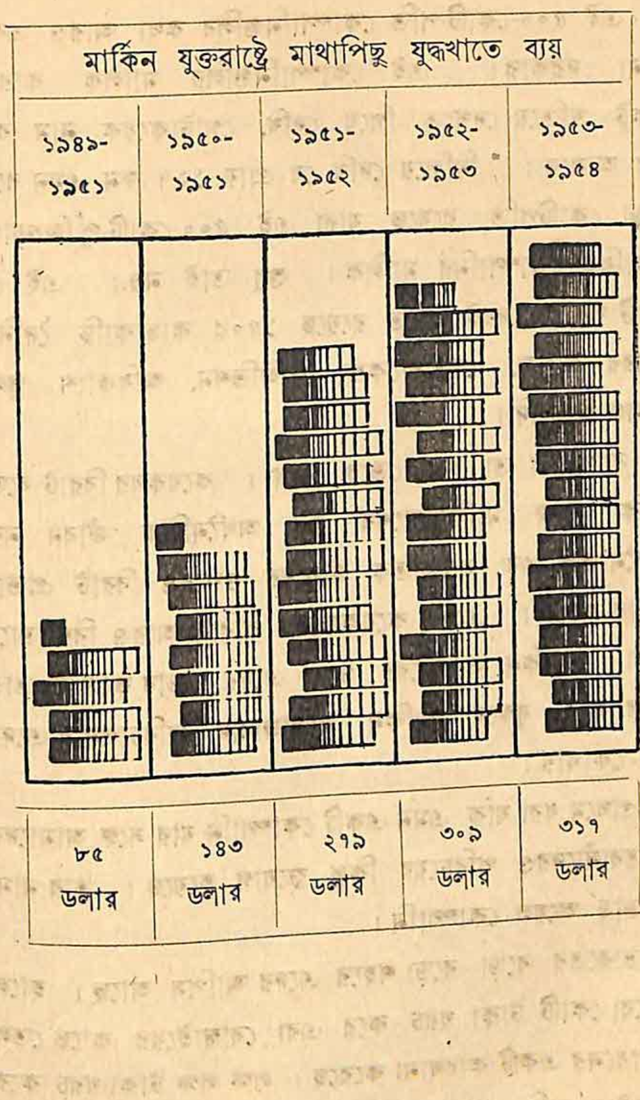
এই ৬৮টি কোম্পানির মধ্যে আছে ২২টি ব্যাঙ্ক, ১৩টি জীবন বীমা কোম্পানি, ৩টি অন্য কোম্পানি, ১৭টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ৬টি রেলওয়ে কোম্পানি, ৪টি নিত্যব্যবহার্য বস্তু-উৎপাদনকারী কোম্পানি ও একটি ব্যবসায়ী কোম্পানি।



যুদ্ধ বাধাতে পারলে মার্কিন মালিকদের লাভটা কী প্রচণ্ড তার হিসেব তো দেখেছো। ছবিতে দেখো, মার্কিনেরা কী ভাবে যুদ্ধের চক্রান্ত করছে। "টাইম্‌স্‌" বলে ওদের কাগজের ১৯৫১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় এই রকম ম্যাপ প্রকাশিত হয়— জাপান ও ওকিনাওয়া থেকে উত্তর-পূব চীনের শিল্পাঞ্চল কী করে আক্রমণ করা যায় তারই ছবি। ছবির নাম ছিলো : "অচল অবস্থা থেকে মুক্তি"।



কিন্তু যুদ্ধের খরচ জোগাচ্ছে কে? আমেরিকারই সাধারণ মানুষ—আমেরিকার, শ্রমিক, কৃষক আর মধ্যবিত্ত কেরানি-কর্মচারী।


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু যুদ্ধখাতে ব্যয়
১৯৪৯-১৯৫১
১৯৫০-১৯৫১
১৯৫১-১৯৫২
১৯৫২-১৯৫৩
১৯৫৩-১৯৫৪
৮৫ ডলার
১৪৩ ডলার
২৭৯ ডলার
৩০৯ ডলার
৩১৭ ডলার

এই ৫০০-কোটি-পতি কোম্পানিগুলির কথা আরও একটু জানা দরকার। এই কোম্পানিগুলির মালিক কারা? একটু খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি, গোটাকয়েক নাম বার বার আসছে। মিলিয়ে দেখি যে প্রায় ১২৭ জন এমন বড়ো বড়ো কোটিপতি রয়েছে যারা এই ৫০০-কোটি-পুঁজিওয়ালা একাধিক কোম্পানির মালিক। শুধু তাই নয়। এই যে কয়টি ঘর, এদেরই হাতে রয়েছে ১৫০র কাছাকাছি দৈনিক খবরের কাগজ, বেতার-কেন্দ্র, টেলিভিশন, অধিকাংশ স্কুল-কলেজ ইত্যাদি।

ব্যাপারটা তা হলে ভেবে দেখো। কয়েকঘর বিরাট বড়ো লোক আজ মার্কিনদেশের শুধু অর্থনৈতিক জীবন নয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ওপরেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করছে। এদের কয়েকজনের পরিচয় আরও বিশদভাবে দেবো। মার্কিন সরকারের ওপর এদের প্রভাব কতোটা তাও বুঝবে আর বুঝবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালনায় এদের হাত কোথায়।

প্রথমে ধরা যাক এমন একটি কোম্পানি যার সঙ্গে আমাদের ভারতবাসীদেরও পরিচয়ের কিছু সুযোগ হয়েছে। তার নাম, ষ্ট্যানডার্ড অয়েল কোম্পানি।

ভারতের বড়ো বড়ো শহরে এদের আপিস আছে। হালে সতেরো কোটি টাকা খরচ করে এরা বোম্বাইয়ের কাছে তেল সংশোধনের একটি কারখানা করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বোম্বাইয়ে বাড়ি করেছে। আমাদের খবরের কাগজগুলিতে

এদের বিজ্ঞাপনের অন্ত নেই।

সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ মিলিয়ে যতো তেল উৎপাদন হয় তার ৫ ভাগের এক ভাগ তেল উৎপাদনে কিংবা বিক্রি করায় হাত আছে এই কোম্পানিটির। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জুড়ে রয়েছে এদের ১৪টি তেলের খনি, আর ৪০টি তেল-সংশোধক কারখানা আর সমস্ত দেশগুলি জুড়ে আছে এদের বিক্রির ব্যবস্থা। পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগ লোককে তেল সরবরাহ করার ক্ষমতা ষ্ট্যানডার্ড অয়েল কোম্পানির আছে তাদের পৃথিবীজোড়া বিক্রি বন্দোবস্তের ওপর নির্ভর করে।

পৃথিবীর তেল ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে ৭টি বড়ো বড়ো তেলের কোম্পানির। এদের মধ্যে তিনটি কোম্পানি হলো মার্কিন-দেশের রকফেলার-গোষ্ঠীর। মার্কিন দেশ, মেক্সিকো ও সোবিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে যতো তেল উৎপন্ন হতো তার শতকরা ৮০ ভাগ করতো এই সাতটি তেল উৎপাদক কোম্পানি।

এই ষ্ট্যানডার্ড অয়েল কোম্পানির যারা মালিক তাদের নাম হলো রকফেলার-গোষ্ঠী এবং মার্কিন দেশের জীবনে রকফেলার পরিবার ও তাদের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান—যাকে আমরা রকফেলার গোষ্ঠী বলছি—তার ক্ষমতা অসাধারণ। যেমন রকফেলার গোষ্ঠী তেমনি আর একটি গোষ্ঠী আছে যার নাম হলো মর্গান গোষ্ঠী।

মার্কিন দেশের এই তেল কোম্পানিগুলি কোটি কোটি টাকা বিদেশে খাটায় আর বিদেশে টাকা খাটানোর ব্যাপারে এদের

সঙ্গে অন্য কোনো মার্কিনী বড়োলোকেরাও পেরে ওঠে না।

তেল নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি এই জন্যে যে আজকের দিনে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই তেলের প্রয়োজন খুব বেশি। তেল ছাড়া কলকারখানা চলে না, যানবাহন অচল হয়। তাই তেল হলো একটি খুব জরুরী জিনিস।

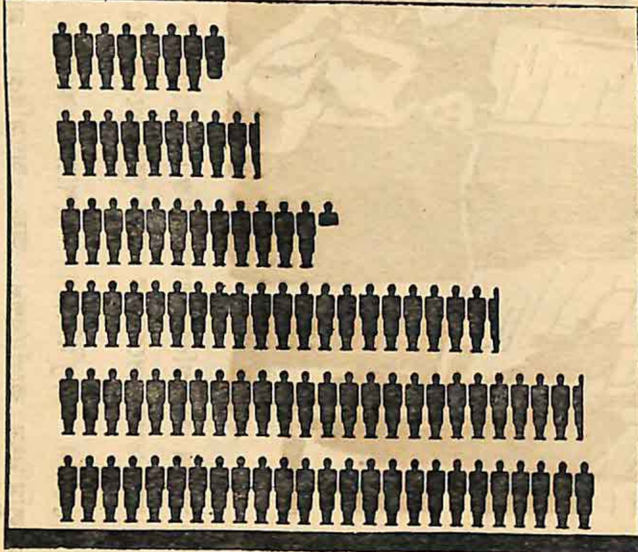
যেমন তেল তেমনি হলো নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ধাতু যা না হলে জিনিসপত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। যেমন ধরো তামা। পৃথিবীতে যতো তামা তৈরি হয় তার প্রায় সমস্তই রয়েছে তিনটি বড়ো মার্কিনী ও কয়েকটি বড়ো ইংরাজ ও বেলজিয়ান কোম্পানির কবলে। মার্কিনী কোম্পানি তিনটির নাম হলো ১) আনাকোণ্ডা, ২) কেনেকট ও ৩) ফেল্পস্ ডজ। মার্কিন দেশে যতো তামার খনি আছে তার ¾ ভাগ এদের সম্পত্তি আর যদি সমস্ত পৃথিবীজোড়া তামার খনির হিসেব নিই তাহলে দেখি এই কোম্পানি তিনটি পৃথিবীর সমস্ত তামার খনির ⅓ ভাগ নিজেদের সম্পত্তি করে রেখেছে।

তেলের ব্যাপারে যেমন রকফেলার গোষ্ঠীর একচ্ছত্র রাজত্ব, তেমনি তামার ব্যাপারে রাজত্ব হলো মর্গান গোষ্ঠীর। জে-পি মর্গান কোম্পানি ও জে-পি-মর্গান কোম্পানি পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৫ সালে ১৬টি তামা কোম্পানির কর্তৃত্ব করতো। রকফেলার ও তাদের পরিচালিত ব্যাঙ্ক নাম—যার চেজ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক—তারা করতো ৭টি কোম্পানির ওপর কর্তৃত্ব।

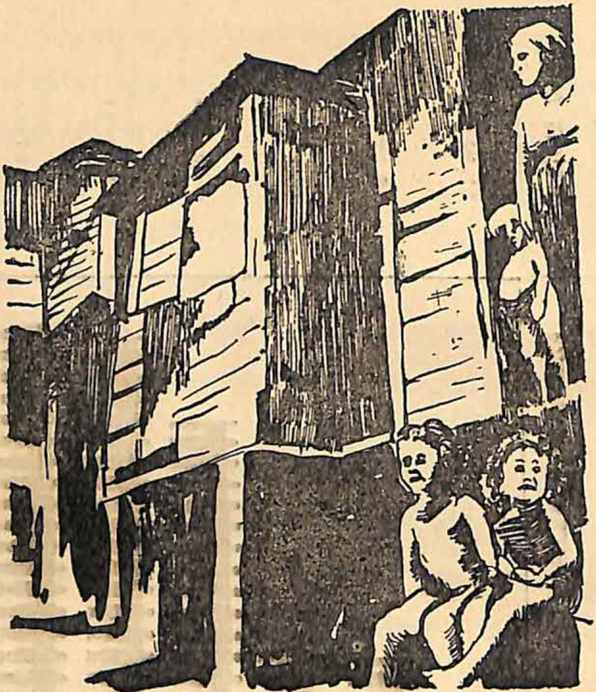
যে মার্কিনী কোম্পানির নাম ইন্টারন্যাশানাল নিকেল কোম্পানি তারাই পৃথিবীর সমস্ত নিকেল উৎপাদনের ⅚ নিজেরাই করে।

॥ আমেরিকার বেকার বাহিনী ॥

মার্কিন সরকারের বাণিজ্য বিভাগের হিসেব অনুসারে



মাস	বেকারের সংখ্যা
অক্টোবর '৫৩	১১,৬২০০০
নভেম্বর '৫৩	১৪,২৮০০০
ডিসেম্বর '৫৩	১৮,৫০০০০
জানুয়ারি '৫৪	৩০,৮৭০০০
ফেব্রুয়ারি '৫৪	৩৬,৭১০০০
মার্চ '৫৪	৩৭,২৫০০০



মার্কিন দেশে গরিব মানুষদের বস্তি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে তাহলে দেশের সব লোকই খুব বড়োলোক হয়ে যায় নি!

তেমনি অ্যালুমিনিয়মের ব্যাপারে একচেটিয়া রাজত্ব করে অ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন অফ আমেরিকা নামে মার্কিনী কোম্পানিটি।

এই অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানিটির ভয়ানক প্রতিপত্তি। কানাডা দেশের অ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের এরা সর্বেসর্বা কর্তা। নরওয়ে ও ইটালির অ্যালুমিনিয়ম কারবার এদের কবলে।



মার্কিন দেশের বস্তি : আর একটি দৃশ্য।

ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ গিয়ানায়, যুগোশ্লাভিয়ায় ও ফরাসীদেশে যা বক্সাইট পাওয়া যায় তা এদের মুঠোয়।

শিল্পের জন্যে যা-যা কাঁচা মাল দরকার তার মধ্যে একমাত্র রবারের ব্যাপারে মার্কিন দেশের পুঁজিপতিরা একটু দুর্বল। যদিও ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়ে বেশ কিছু রবারের বাগিচা মার্কিন ব্যবসায়ীরা কিনেছে কিন্তু তা থেকে এরা প্রয়োজনমতো রবার



বিলিয়ন্-ডলার ক্লাবের দেশ, কিন্তু গরিবদের দশাটা নেহাতই গরিবদের মতো। বস্তির দৃশ্য।

পায় না। অধিকাংশ রবার এদের কিনতে হয় ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ কোম্পানিগুলির কাছ থেকে।

কাঁচামালের ব্যাপারে মোটমাট অবস্থা যে দাঁড়ায় তা হলো এই : পৃথিবীর লোকসংখ্যার তুলনায় মার্কিন দেশের লোক-সংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ। কিন্তু কাঁচা মাল দখলের ব্যাপারে সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশগুলিতে যা কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ যায় মার্কিন কোম্পানিগুলির দখলে।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচা মাল নিয়ে যাওয়াটা সাধারণ লেনদেন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। নিজের দেশের কাঁচা মাল দিয়ে নিজের দেশের কলকারখানায় নানা রকম জিনিসপত্র উৎপাদন করতে প্রত্যেক দেশের লোকই চায়। কারণ তারই

নাম দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি। কিন্তু বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো চায় যে তাদের উপনিবেশগুলো তাদের কাঁচা মাল দিয়ে যাক সস্তায় ; উপনিবেশগুলোতে যেন কোনো শিল্পোন্নতি না হয়। কারণ যতোদিন না শিল্পোন্নতি হবে ততোদিনই উপনিবেশ-গুলো সস্তায় কাঁচা মাল দিতে বাধ্য হবে। এবং এই কাঁচা মাল থেকে নানান জিনিস তৈরি করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিক্রির জন্যে আবার সেই জিনিসগুলোই রপ্তানি করবে উপনিবেশগুলোতে আর এমনিভাবেই চলবে তাদের ডবল লাভ। ঠিক এই কাজই একদিন করতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের দেশের তুলো নিয়ে যেতো ম্যানচেষ্টারে, তার পর সেই তুলোর তৈরি কাপড় এনে বিক্রি করতো ভারতবর্ষে। তারই বিরুদ্ধে আমাদের দেশে হয়েছিলো বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন। আমাদের দেশে বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করে।

আজ মার্কিন দেশের পুঁজিপতিরা ঠিক তাই করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচা মাল নিয়ে যাওয়া তাই একটা সাধারণ লেনদেন নয়। এর পেছনে রয়েছে পুরাতন শোষণের কায়দা।

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে গুটিকয়েক উদাহরণ দেখলে।

অল্পদিন আগে কাগজে পড়েছো যে, মার্কিন সরকারের আক্রমণে গুয়াতেমালায় যে জনপ্রিয় সরকার ছিলো তা হটে যেতে বাধ্য হয় আর মার্কিনদের মনের মতো এক নতুন সরকার গঠন করা হয়। আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছিলো ?

নাইজেরিয়ায় যেমন ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানি তেমনি

দক্ষিণ আমেরিকার কষ্টারিকা, পানামা, হণ্ডুরাস, গুয়াতেমালা প্রভৃতি রাষ্ট্রের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য করতো মার্কিন কোম্পানি নাম যার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি। এই কোম্পানিটি একটি সাম্রাজ্যবিশেষ : দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন ৮টি দেশের যা সব-থেকে ভালো চাষের জমি তার মধ্যে ১৬৭৬৮৯৫ বিঘার বেশি জমি এই কোম্পানিটির সম্পত্তি। বিষয়-আশয়ের মধ্যে এদের আছে ১৪৭৪ মাইল রেলপথ, -০৯ মাইল ট্রামপথ, ৭২০৮২টি জন্তুজানো-য়ারের খোঁয়াড়, ৬৬টি বড়ো বড়ো সমুদ্রগামী জাহাজ ইত্যাদি। সমস্ত মার্কিন দেশ জুড়ে এদের মাল বিক্রির জন্যে আছে ৪৫টি শাখা—আমেরিকার বিভিন্ন শহরে। এই কোম্পানিটির ব্যবসায় একচ্ছত্র আধিপত্যে গুয়াতেমালার সরকার বাধা দেয়। গুয়াতে-মালার সরকার এদের কিছু জমি রাষ্ট্রের জমি হিসেবে দখল করে। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি তখন ক্ষতিপূরণ দাবি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জনপ্রিয় সরকারকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সশস্ত্র আক্রমণ করে এই সরকারকে পরাস্ত করে এবং নিজেদের পছন্দমতো সরকার গঠন করে। (জুলাই ১৯৫৪)।

ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি দক্ষিণ আমেরিকার এই বিভিন্ন দেশগুলিকে কীভাবে লুণ্ঠন করেছে তার একটি হিসেব : যে কলা ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি আমেরিকায় বিক্রি করছে পাউণ্ডে ১৫.৯ সেণ্ট দরে সেই কলার জন্যে দক্ষিণ আমেরিকার কৃষককে তারা দিয়েছে পাউণ্ডে ১.৭ সেণ্টের কম। সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও দেখা যাচ্ছে যে, ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি

প্রতি পাউণ্ডে লাভ করছে ১১ সেণ্ট করে অথবা ১৯৪৮ সালে যা মোট কলা রপ্তানি হয়েছিলো সে-হিসাবে ১৬৫ কোটি টাকা। এই অসম্ভব লাভ করতে পেরেছে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জোরেই। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কবলে না থাকলে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের গরিব কৃষক কখনই অতো অল্প দামে কলা বিক্রি করতে বাধ্য হতো না।

উপনিবেশের কাঁচা মাল কিনে, বিদেশে টাকা খাটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে অতিরিক্ত মুনাফা পায় তার উদাহরণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে দেখেছো। এবার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির লাভের অংশও দেখলে। আরও দু-একটা উদাহরণ দেখো। আমেরিকা ব্রেজিল থেকে অনেক কফি আমদানি করে। কিন্তু যেহেতু কফির ব্যবসা ৭টি বড়ো মার্কিন কোম্পানির কবলে সেই হেতু যে দামে মার্কিন দেশে কফি বিক্রি হয় তার অর্ধেক দামও ব্রেজিলের কফি-চাষী পায় না। ১৯৪৮ সালের হিসেব নিলে দেখা যায় যে প্রতি পাউণ্ডে এই বড়ো বড়ো মার্কিন কফি কোম্পানিগুলি লাভ করেছে ১৩ সেণ্ট করে—মোট প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। ব্রেজিলের গরিব চাষী অবশ্য এই বিরাট লাভের সামান্য অংশও পায়নি কারণ সে সাম্রাজ্যবাদের কবলে।

যেমন ব্রেজিলের ব্যাপারে তেমনি মেক্সিকো থেকে যে-সমস্ত কাঁচা মাল আমেরিকায় চালান যায় তার পরিবর্তে মেক্সিকোর কৃষক মাত্র এক বছরেই—১৯৪৭ সালে—বঞ্চিত হয়েছে প্রায় ২৪ কোটি টাকার কাছাকাছি।

আফ্রিকার লাইবেরিয়া একটি মার্কিন উপনিবেশ। ১৯৪৭

সালে লাইবেরিয়া থেকে রপ্তানি মালের মোট মূল্য দাঁড়ায় ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এর মধ্যে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে যায় দেশের বাইরে নিজের বখরা হিসেবে। অর্থাৎ লাইবেরিয়ার জনসাধারণ তাদের মেহনতের টাকার শতকরা ৩৫ ভাগও রাখতে পারে না নিজেদের দেশে।

সৌদি আরব থেকে যে তেল পৃথিবীময় বিক্রি করে ষ্ট্যানডার্ড অয়েল তার ১০ ভাগের ১ ভাগ অর্থও সে-দেশের ভোগে আসেনা।

চিলি দেশে যা তামা ও নাইট্রেট তৈরি হয় তার শতকরা ৪০ ভাগের জন্যে চিলির জনসাধারণ এক পয়সাও পায় না।

লাটিন আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো সাম্রাজ্য। মার্কিন সাম্রাজ্য প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশ থেকে যে ৩৭৫০ কোটি টাকা শোষণ করে তার মধ্যে ১২৫০ কোটি টাকাই আসে লাটিন আমেরিকার জনসাধারণকে শোষণ করে। ফলে, সমস্ত লাটিন আমেরিকায় সমস্ত মানুষের শ্রমে যা বাৎসরিক উৎপাদন তার ৫ ভাগের এক ভাগ যায় মার্কিন সাম্রাজ্যের কবলে।

আমেরিকার কাছে কাঁচা মাল, ফল, সব্জি পাঠিয়ে যেমন বঞ্চিত হয়েছে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, তেমনি মার্কিন দেশ থেকে তৈরি জিনিস আমদানি করতে গিয়ে তাদের দিতে হয়েছে দ্বিগুণ দাম।

মার্কিন দেশের ইণ্টারন্যাশানাল হারভেসটার কোম্পানি আমেরিকায় যে দরে তাদের মাল বিক্রি করতো তার ঢের বেশি দরে সেই জিনিসই বিক্রি করতো আর্জেন্টিনায়। ১৯৫০ সালে আর্জেন্টিনার সরকার এই প্রথা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। শেষ

পর্যন্ত মার্কিন সরকারের হুমকিতে রাজী হতে বাধ্য হয় যে আমেরিকার তুলনায় আর্জেন্টিনায় শতকরা ৭৫ ভাগ চড়া দামে জিনিস বিক্রি হবে।

ইস্পাত ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যাপারটা দেখো। ১৯৪৮ সালে সাধারণ ইস্পাত পাতের দাম প্রতি এক শো পাউণ্ডে ছিলো ৩ ডলার ২০ সেণ্ট আর সেই ইস্পাত পাতের রপ্তানি-মূল্য ছিলো ৫ ডলার ৫৮ সেণ্ট। কষ্টিক সোডার এক শো পাউণ্ডের দাম ছিলো ২ ডলার ৮৫ সেণ্ট আর রপ্তানি-মূল্য ধার্য হয় ৬ ডলার ২৭ সেণ্ট করে। এই সব জিনিস আমদানি করতে সব থেকে বেশি দাম দিতে হয় দক্ষিণ আমেরিকার ও এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে।

এতোক্ষণ যা বলেছি তা থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে উপনিবেশে টাকা খাটিয়ে, অনুন্নত দেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানি করে ও সেই সমস্ত দেশে তৈরি জিনিস বিক্রি করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অতিরিক্ত মুনাফা কামাচ্ছে।

এই অতিরিক্ত মুনাফার হার আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারে দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, যে-সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিদেশে টাকা খাটায় তাদের গড়পড়তা লাভ, যারা বিদেশে টাকা খাটায় না তাদের থেকে, অনেক বেশি। মার্কিন দেশের পুঁজিপতিদের লাভের হিসেব নিলে ঠিক সেই কথাই চোখে পড়ে।

১৯৪৮ সালের লাভের হিসেব

	স্বদেশে	বিদেশে
	(শতকরা)	
ষ্ট্যানডার্ড অয়েল	১১	৩৩
জেনারেল মোটর্স	২৫	৮০
আনাকোণ্ডা তামা	৫	১৩
ফায়ারষ্টোন রবার	৭	২৬

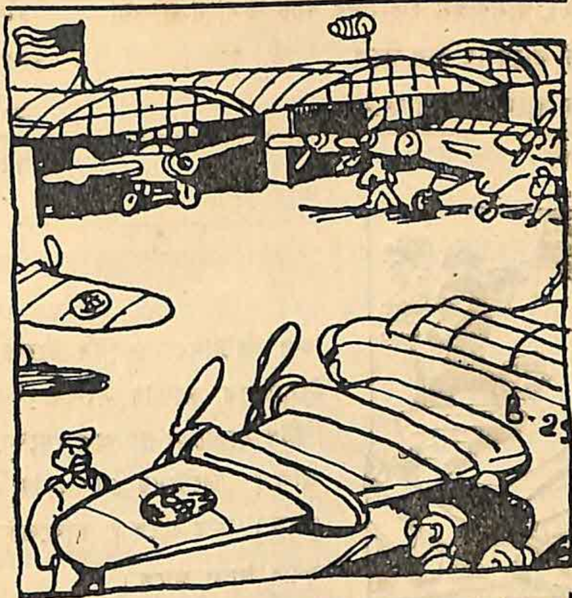
স্বদেশে যা লাভ হয় তার চারগুণ লাভ হয় বিদেশে টাকা খাটিয়ে, এ-কথা মার্কিন দেশের বড়ো বড়ো পুঁজিপতিরা নিজেরাই স্বীকার করছে।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন পুজিপতিরা শুধু বিভিন্ন দেশে তাদের টাকা খাটিয়ে পেয়েছে মোট প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এই সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি মার্কিন সরকারের নিজের স্বীকৃতি থেকে। আসলে এর থেকে ঢের বেশি টাকা নিশ্চয়ই মার্কিন পুঁজিপতিরা বিদেশ থেকে নিয়েছে।

পুঁজিপতিরা ঠিক কতো টাকা বিদেশ থেকে শোষণ করছে —তা ধরা খুবই শক্ত। কারণ, নানাভাবে তা তারা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেটুকু তারা স্বীকার করে, তাতেই বোঝা যায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কী তীব্র। ১৯৪৮ সালের এইরকম একটি হিসেব দেখো :

বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে অর্জিত টাকা—১৯৪৮ সালে

	(১০ লাখে)
লাভ হিসাবে পাওয়া—	৯৩০০



আমেরিকার কাছে দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে ব্রিটেনের শাসক-শ্রেণী। দেশ-বিক্রয়ের কী মূল্য পেয়েছে ব্রিটেনের জনসাধারণ? যেখানে ছিলো ছোটোদের খেলাধুলোর সবুজ মাঠ সেখানে মাথা চাড়িয়ে উঠেছে মার্কিন বিমান-ঘাঁটি। যে-দেশ শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন্‌, ডিকেন্‌স-এর মতো বিশ্ব-সাহিত্যিকদের জন্মভূমি, সেদেশের মানুষকে আমেরিকা উপহার দিচ্ছে—খুনখারাবি, ডাকাতি আর রাহাজানির উপন্যাস।



বীমা, যানবাহন ইত্যাদির খরচ হিসাবে পাওয়া	৯৫০০
চড়া দামে বিক্রির ফলে	১২৫০০
কম দামে কেনার ফলে	৬০০০
মোট	৩৭৫০০



'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্‌স্‌'! ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত! তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না। আজ? ব্রিটেনের সে-গুমোর ভেঙে গেছে। কার কাছে? ছবিতেই তার জবাব আঁকা আছে।

কিন্তু শুধু কাঁচামাল ও খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে কিংবা খনিজ ধাতুর ব্যাপারেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যদেশের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছে না। মার্কিন দেশের সবথেকে বড়ো একচেটিয়া কলকারখানার মালিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টাকা খাটাতে পেছপাও নয় এবং এতোদিন পর্যন্ত যে সমস্ত দেশগুলিকে আমরা স্বাধীন ও উন্নত বলে জেনেছি, যেমন ফরাসী দেশ বা ইংল্যাণ্ড, মার্কিন পুঁজি সেই দেশগুলিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত আছে। প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও আজ নিজেরাই

মার্কিন উপনিবেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

যেমন ধরো মোটরগাড়ি তৈরির ব্যাপার। ফোর্ড ও জেনারেল মোটর কোম্পানির হাতে কী ক্ষমতা দেখো। মার্কিনদেশের বাইরে যতো মোটরগাড়ি তৈরি হয় (অবশ্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি বাদদিয়ে) তার মধ্যে শতকরা ৪০টি গাড়ি ফোর্ড বা জেনারেল মোটরের বিদেশস্থিত কারখানায় তৈরি। কানাডা দেশে মার্কিন কোম্পানিদের প্রতিপত্তি বিশ্ববিদিত। এমনকি জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডে যে সব গাড়ি তৈরি হয় তার মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ মার্কিন কারখানার গাড়ি।

তেমনি ফোর্ড কোম্পানির যে অংশ চাষের জন্যে ট্র্যাক্টর তৈরি করে এবং ইন্‌টারন্যাশনাল হারভেসটর কোম্পানি। এদের কারখানা ইউরোপের কয়েকটি দেশে রয়েছে।

মার্কিন রবার টায়ার কোম্পানিগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কারখানা খুলেছে।

মার্কিন দেশের মর্গান-গোষ্ঠীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মর্গান বা রকফেলারের কথা বলতে গিয়ে লোকে বলে মর্গান সাম্রাজ্য, রকফেলার সাম্রাজ্য। আর বলবে নাই বা কেন! যাবতীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র—সে যতো ছোটোই হোক বা যতো বড়োই হোক—তা তৈরি হয় এই মর্গান-গোষ্ঠীর কবলিত কোনো না কোনো কারখানায়। এবং এই মর্গান সাম্রাজ্য শুধু মার্কিন দেশকেই গ্রাস করেনি, পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরো এই মর্গান গোষ্ঠীর একটি শাখার কথা: নাম তার ইন্‌টারনাশনাল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানি। টেলিফোন,

টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যাপারে যাবতীয় জিনিস এই কোম্পানি তৈরি করে কানাডায়, আর্জেন্টিনায়, ব্রেজিলে, চিলিতে, ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে, হল্যাণ্ডে, সুইডেনে, সুইজারল্যাণ্ডে, অষ্ট্রিয়ায় ও অষ্ট্রেলিয়ায়। এ ছাড়া অনেক দেশে এই কোম্পানিটি টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ষ্টেশন প্রভৃতি চালনা করে।

মর্গান-গোষ্ঠীর বৈদ্যুতিক শক্তির সংলগ্ন যাবতীয় উদ্যোগ দেখাশোনা করে আমেরিক্যান অ্যাণ্ড ফরেন পাওয়ার কোম্পানি বলে একটি সংগঠন। দক্ষিণ আমেরিকার ১১টি দেশে এদের কর্মক্ষেত্র। মর্গান-গোষ্ঠীর বৈদ্যুতিক সাম্রাজ্যের সম্রাট হলো জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি : পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী সংগঠন। ১৯৪৫ সালের হিসেবে দেখা যায় যে জাপান, জার্মানি, ফরাসীদেশ, মরোক্কো, ইংলণ্ড ও ইটালি দেশে যে সমস্ত বড়ো বড়ো কোম্পানি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কাজ করতো তার মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে শতকরা ৪৯ ভাগ অংশ ছিলো মার্কিন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির জিম্মায়। ১৯৪৮ সালের হিসেবে দেখা যায় যে জেনারেল ইলেকট্রিক অংশীদার হিসাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কাজ করছে অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, হল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন ও তুরস্কে। এ ছাড়া সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কারখানা অর্থাৎ অন্য কোনো অংশীদার না নিয়ে এরা চালাতো আর্জেনটিনায়, ব্রেজিলে, মেক্সিকোতে, উরুগুয়েতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আর চীনদেশে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই জেনারেল

ইলেকট্রিক কোম্পানি মার্কিন দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রায় ৪২ কোটি টাকা নিয়োজিত করেছে।

কিন্তু শুধু শিল্প উৎপাদনে নিজেদের কর্তৃত্ব রাখলে সাম্রাজ্যবাদের চলে না। উৎপন্ন জিনিসগুলি সবথেকে চড়া দরে বিক্রির জন্যে তার চাই একচেটিয়া বাজার। এই একচেটিয়া বাজার পাবার জন্যে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শিল্পপতিরা নিজেদের মধ্যে গোটা পৃথিবীটার ভাগবাঁটোয়ারা ও নানা রকম সমঝোতা করে।

এই রকম সমঝোতা করতে গেলে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক সমঝোতার চেষ্টা করতে হয়। অবশ্য এ আন্তর্জাতিক সমঝোতা বিশ্বশান্তির জন্যে নয়; এ যেন দুই বা তিন ডাকাতের বন্ধুত্ব—যার ফলে এ বলে ভাই তুই এই বাড়িটা লুট কর আর আমি ওমুক বাড়িটা লুট করি। অর্থাৎ এই রকম সমঝোতায় সাধারণ লোকের সর্বনাশ। এই রকম আন্তর্জাতিক সমঝোতা করতে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দ্বিধা করে না। তাতে তাদের নিজেদের দেশের জনসাধারণের ক্ষতি হয় তো বয়েই গেলো!

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত মার্কিনদেশের বড়ো বড়ো একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই রকম সমঝোতা করেছিলো রাসায়নিক, তেল, ইস্পাত, সালফার, তামা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, দস্তা, পটাশ, নাইট্রেট, অ্যালুমিনিয়াম সম্পর্কে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈরি ও বিক্রির ব্যাপারেও এই রকম একটি সমঝোতা হয়েছিলো মার্কিন ষ্ট্যানডার্ড

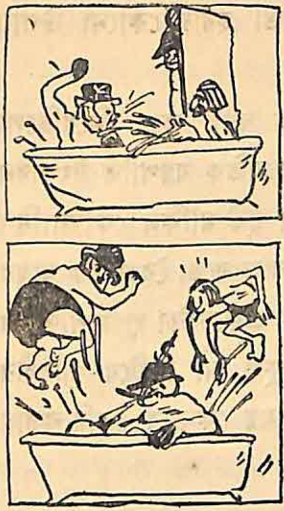
অয়েল কোম্পানি ও জার্মানির আই জি ফারবেন কোম্পানির মধ্যে এবং মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই বন্ধুত্বের নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সমঝোতা একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অনেকদিন থেকেই করে আসছে। ১৮৯৬ সালে মার্কিন কোম্পানি মেলনস্ অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন সুইস-জার্মান অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানীর সঙ্গে এই রকম একটি সমঝোতা করেছিলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও এই ধরনের একচেটিয়া সমঝোতা হয়ে চলেছে। গোটা পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে বিভিন্ন দেশের ইস্পাত কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে, এই রকম মিলমালিকরা। এই সমঝোতার সবথেকে বড়ো পাণ্ডা হলো মার্কিনদেশের ইউনাইটেড এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ফাউণ্ড্রি কোম্পানি। মার্কিনদেশের যতো ইস্পাত কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন হয় তার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগই করে এই ইউনাইটেড এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ফাউণ্ড্রি কোম্পানি।

১৯৪৭ সালে এই কোম্পানিটি পৃথিবীর এই ধরনের বিভিন্ন পুঁজিপতি কোম্পানিগুলির সঙ্গে আবার সমঝোতা করে নেয়।

এইসব সমঝোতার ফলে বিভিন্ন দেশের ইস্পাত কারখানায় কলকারখানা তৈরি করার যে সমস্ত কোম্পানি তারা সকলেই প্রায় এই মার্কিন কোম্পানিটির মাল-বিক্রির দালালের পদে নেমে আসতে বাধ্য হয়। ব্যাপারটা যে কী ভয়ানক তা ভেবে



।। আমেরিকার সমাধান ।।

সুয়েজ খালের ওপর বেআইনি দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিশরের দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ চলছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এই বিরোধের সমাধান করে দিয়েছে। কীভাবে? সুয়েজ খালের ওপর থেকে ইংল্যাণ্ডকে হটিয়ে দিয়ে সে নিজেই তার জায়গা দখল করে বসেছে।

দেখো। ইংল্যাণ্ডে, ফান্সে, ইটালিতে বা অন্য যে-কোনো দেশে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে এই মার্কিন কোম্পানিটির তাতে সম্মতি আছে কিনা তার ওপর এবং তারা যদি বা এই সম্মতি দেয় তাহলে তারা এই ব্যবস্থাও করে নেয় যে লাভের বেশ কিছু অংশ এদের হাতে আসবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই মর্গান গোষ্ঠীর অন্তর্গত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি ও মেলন-রকফেলার গোষ্ঠীর অন্তর্গত ওয়েষ্টিংহাউস সমস্ত মার্কিন দেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলো কে কোথায় বিক্রি করবে, কী জিনিস বিক্রি করবে, কতো দামে করবে ইত্যাদি। এবং তার ফল হলো এই যে, যে জিনিসটার ন্যায্য দাম হয়তো দু আনা, ইচ্ছা করলে সে জিনিসটার দামই ৮ আনা বা ১৲ টাকা করে দিতে এদের কোনো বাধা

হতো না, কারণ কোনো প্রতিযোগিতা হবার কোনো উপায় ছিলো না।

১৯৩০ সালে গোটা পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছিলো এইরকম ৯টি বড়ো বড়ো একচেটিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন কোম্পানি আর এই ৯টির মধ্যে ছিলো দুটি মার্কিন কোম্পানি।

যেমন ইস্পাতের বেলায় তেমনি বড়ো বড়ো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বেলাতেও ঘটনা সেই দাঁড়ালো যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের লাভের ক্ষুধা না মিটিয়ে পৃথিবীর কোনো দেশেই বড়ো বড়ো বৈদ্যুতিক যন্ত্র কেনা বা তৈরি করার ব্যবস্থা করা যাবে না।

॥ ব্যাঙ্ক সাম্রাজ্য ॥

এই বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পেছনে আছে গুটিকয়েক বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক। এবং এই ব্যাঙ্কগুলি যে শুধু মার্কিন দেশের মধ্যেই কাজ করে তা নয়, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাইরেও টাকা খাটানোর চেষ্টার ত্রুটি করে না। বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলি বিদেশে সাম্রাজ্যবিস্তারের মন্ত্রণাদাতা ও নেতা হিসেবে কাজ করে। ১৯৩০ সালের আগে এরা নিজেদের নামেই খোলাখুলি বিদেশে টাকা নিয়োজিত করা বা খাটানোর কাজ করতো। কিন্তু ইদানীং তারা অনেক বেশি চালাক হয়েছে; তারা নিজেরা সামনাসামনি না এসে মার্কিন সরকারের মধ্যে দিয়ে কাজ করে।

মার্কিন সরকার যতো ঋণ দেয় বা বিদেশে টাকা খাটায় তার আসল মালিক থাকে এরাই। এদের লোকেরাই সরকারের রাজকোষ বিভাগ চালায় এবং টাকাপয়সার ব্যাপারে সরকারকে

মন্ত্রণা দেয় এই সব বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের মালিকরা।

সরকারী ঋণের যা সুদ তার অধিকাংশই যায় এদের পকেটে। কারণ সরকারী বণ্ডগুলির অধিকাংশই এদের হাতে আর বছরে এই টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এর থেকেই বোঝা যায় মার্কিন সরকার বিদেশে যা কিছু করে তার সঙ্গে এই সব একচেটিয়া বড়ো পুঁজিপতিদের স্বার্থ রয়েছে গভীর ভাবে জড়িত। কিন্তু মার্কিন সরকারকে ঋণ করতে হয় কেন? ঋণ করতে হয় যুদ্ধের খরচের জন্যে। কাজেই যতো যুদ্ধ মার্কিন সরকার বাধাতে পারে ততোই লাভ হয় এই পুঁজিপতিদের। কারণ সরকারী ঋণ যায় বেড়ে আর সেই ঋণের সুদ হিসেবে পুঁজিপতিদের আয় যায় বেড়ে।

মার্কিন দেশের ৪টি সবথেকে বড়ো ব্যাঙ্ক National City (মর্গান গোষ্ঠীর) Chase National (রককেলার গোষ্ঠীর) Guaranty Trust (মর্গান গোষ্ঠীর) Bank of America (গিয়ানামী গোষ্ঠীর) শুধু যে মার্কিন দেশের ওপর রাজত্ব করে তাই নয়—পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মার্কিন স্বার্থের দুর্গ হিসাবে কাজ করে।

ন্যাশানাল সিটি ব্যাঙ্কের ৫১টি বৈদেশিক শাখা আছে। এই বৈদেশিক শাখাগুলিতে যা টাকা জমে তার আন্দাজ পাওয়া যায় এদের ১৯৪৭ সালের হিসেব থেকে। ঐ বছর শুধু বৈদেশিক শাখাগুলিতে টাকা জমেছিলো ৩৬৮০০০০০০০ টাকা।

॥ মার্কিন সাম্রাজ্য : ভৌগোলিক রূপরেখা ॥

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে মার্কিন সাম্রাজ্য-

বাদের কায়দাকানুন, শোষণের কায়দা সম্বন্ধে আমরা কিছু তথ্য দেখেছি। আমেরিকান সাম্রাজ্যের একটা ভৌগোলিক হিসাব এবার করা যাক।

যে সমস্ত দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত তাদের নাম ও লোকসংখ্যা ; (১০ লক্ষের হিসাবে) আলাস্কা = ০·১ ; কানাডা = ১৩ ; গ্রীনল্যাণ্ড = ০·০২ কিউবা = ৫ ; মেক্সিকো = ২৩ আটটি ছোট মধ্য-আমেরিকান রাষ্ট্র ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ = ১৫ ; পুয়েরটোরিকো = ২ ; ভেনেজুয়েলা = ৪ ; কলম্বিয়া = ১১ ; পেরু = ৮ ; চিলি = ৬ ; বলিভিয়া = ৪ ; ব্রেজিল = ৪৮ ; গায়না (ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ) = ১ ; আরুবা = ০·১ হাওয়াই = ০·৫ ; ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ = ২০ ; সৌদি আরব ও বেহেরিন দ্বীপ = ৬ ; তুরস্ক = ১৯; ইসরাইল = ১ ; গ্রীস = ৮ ; লাইবেরিয়া = ২ × মোট = ১৯৭। ১০ লক্ষ।

এ ছাড়া অন্তত ৫টি দেশে মার্কিন সামরিক শক্তি বেড়ে চলেছে এবং অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে পেছু হটিয়ে দিয়ে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে :

	লোকসংখ্যা (১০ লক্ষে)
যেমন : আর্জেন্টিনা	১৬
স্পেন	২৮
ইজিপ্ট	১৯
থাইল্যাণ্ড	১৭
যুগোশ্লাভিয়া	১৬
মোট	৯৬ × ১০ লক্ষ



সাহায্যের নামে আমেরিকা দেদার ডলার ঢেলেছে ইটালিতে। সেই 'সাহায্য' কি যুদ্ধবিধ্বস্ত ইটালির সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যও দিতে পেরেছে? আমেরিকার সাহায্য পেয়ে ইটালির কচি বাচ্চারা কেমন সুখে আছে দেখো: তিন-চারটি ভাইবোন একখানা সরু তক্তাপোষের ওপর কুঁকড়ে-মুকড়ে কেমন সুখে ঘুমোচ্ছে!

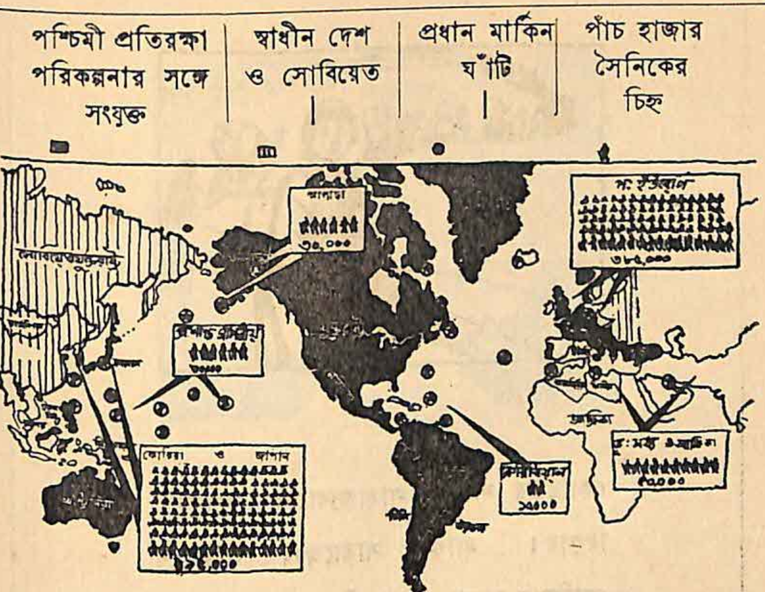
জাপান (জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ) ও পশ্চিম জার্মানি (জনসংখ্যা ৪ কোটি ৮০ লক্ষ) মার্কিন সাম্রাজ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আমেরিকার পুঁজিপতিরা এই দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং জার্মানি (পশ্চিম) আজও আমেরিকার দখলে রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বড়ো বড়ো মার্কিন পুঁজিপতিরা বহু কোটি টাকা এ দেশ দুটিতে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু যেহেতু এ দুটি দেশই যথেষ্ট উন্নত তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখানে এখনও পুরোপুরি কায়েমী হয়ে বসতে পারেনি।

বিভিন্ন প্রকারের সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের কথা মনে রেখে ১৯৫০ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যের মোটামুটি হিসেব এইরূপ দাঁড়ায়

	লোকসংখ্যা (১৯৪৭) (১০ লাখের হিসাবে)
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১৪৪
পরিপূর্ণ ঔপনিবেশিক শোষণ	১৯৭
যে সমস্ত দেশ ক্রমেই মার্কিন সাম্রাজ্যের কবলে যাচ্ছে	৯৬
সামরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত	১২৬
	৫৬৩

পাক-মার্কিন চুক্তির ফলে পাকিস্তানকেও এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ। কাজেই মোট হিসেব দাঁড়াচ্ছে ৬০ কোটি ৮৮ লক্ষ।

❖



পৃথিবীজোড়া মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি

পৃথিবীর নানান দেশে মার্কিন পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে। মোট মার্কিন সৈন্য : ৩৫ লক্ষ। তার মধ্যে খাস আমেরিকায় আছে ২৪ লক্ষ আর বিদেশে বাকি ১১ লক্ষ। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : কোরিয়ায় ও জাপানে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার; পশ্চিম ইউরোপে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার; মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকায় ৫০ হাজার; প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে ৩০ হাজার; ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলিতে ১০ হাজার; আলাস্কা এবং অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ৩০ হাজার। আমেরিকার বাইরে ২৭টি দেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন আছে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি দেশে মার্কিন সামরিক শিক্ষা ও পরামর্শ মিশন আছে।



কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্যতা' বিস্তার। মার্কিন সাম্রাজ্যের আক্রমণে কোরিয়ার হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নেমেছে। নিচে : বোমাবিধ্বস্ত কোরিয়ার গ্রামের ছবি।





মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা ফুরোলো : পৃথিবীর ৬০ কোটি ৮৮ লক্ষ মানুষ আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবে। কিসের জোরে? টাকার জোরে —ডলারের জোরে। তাই একে 'ডলার সাম্রাজ্যবাদও' বলতে পারো।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ

কিছুদিন আগে ফরাসীদেশে একটা হিসেব নেওয়া হয়। হিসেবটা একটু অদ্ভুত ধরনের। হিসেবের ক্ষেত্র ছিলো মানুষ, কিন্তু এমন মানুষ যাদের মৃত্যু হয়েছে। হয়তো ভাববে, এ কী বেয়াড়া ধরনের ব্যাপার! কিন্তু সবটা শুনলে হিসেবের কায়দা ও উদ্দেশ্য বুঝবে। ফরাসী অর্থবিদ্‌রা বললেন যে, ফরাসীদেশে যতো লোক মারা যায় তার একটা বিশ্লেষণ আমরা করবো আর দেখবো যে মরার পর কতো লোক কতো সম্পত্তি রেখে যায়। যা সম্পত্তি রেখে যায় তার থেকে আন্দাজ হবে যে বিভিন্ন মানুষের জীবিত অবস্থায় আয় ছিলো কতো। আর এই আয়ের আন্দাজ পেলেই আমরা মোটা-মুটি বুঝতে পারবো, কোন লোক আর কতো লোক সমাজের কোন স্তরে ছিলো। এই হিসেবের ফল কী দাঁড়ালো দেখো: দেখা গেলো, প্রতি ১ হাজার মৃতের মধ্যে ৩৫৫ জন এক কানা-কড়িও সম্পত্তি রেখে যায় না। প্রতি ১৬০ জন ঘটি, বাটি, জামা-জুতো এইসব মিলিয়ে যা রেখে যায় তার মোট মূল্য বড়ো জোর ৩০০ টাকা। প্রতি ১৯০ জন যা সম্পত্তি রেখে যায়, তার মূল্য হচ্ছে ৩০০ থেকে ১৮০০ টাকা। প্রতি ২১০ জন যা সম্পত্তি রেখে যায়, তার মূল্য দাঁড়ায় ১৮০০ টাকা থেকে ৯০০০ টাকা। প্রতি ৭০ জন যা সম্পত্তি রেখে যায় তার মূল্য ৯০০০ টাকা থেকে ৪৪ হাজার টাকা। আর প্রতি ১৫ জনের সম্পত্তি থাকে ৪৪ হাজার টাকার বেশি।

অর্থবিদ্‌রা এই হিসেবের আরও ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, যে ২১০ জনের সম্পত্তি ১৮০০ টাকার বেশি, তারা সমস্ত জাতীয়

সম্পত্তির শতকরা ৫৫ ভাগ ভোগদখল করে। তাঁরা আরও বললেন যে, প্রতি হাজারে ১০ জন জাতীয় সম্পত্তির শতকরা ৪০ ভাগ ভোগদখল করে।

আরও পরিষ্কার করে দেখানোর জন্যে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, ১½ লক্ষ টাকার বেশি সম্পত্তির অধিকারী লোক ফরাসী দেশে কতো আছে ? উত্তর হলো : সব মিলিয়ে ১ লাখ। প্রশ্ন করলেন, ১০ লাখ টাকা সম্পত্তির অধিকারী লোক কতো ? উত্তর হলো : দশ হাজার।

অর্থবিদ্‌রা বললেন, এরাই হলো ফরাসী দেশের মাথা।

এই মাথাদের আরও একটু পরিচয় নেওয়া যাক ! প্রথমে দেখো, বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিকদের। যতো বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিক আছে তাদের এক মস্ত মাথা হলো 'কমিতি দেস্ ফর্জে স্' (Comite des Forges)। কথাটা ফরাসী, কিন্তু মানেটা কী ? মানে হলো, নিয়োগকর্তাদের সংগঠন। এই সংগঠন বা জুটি ফরাসী দেশের বড়োলোক কল-মালিকদের একটি বিশেষ পুরনো প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৪ সালে এর জন্ম। আর এই সংগঠনে আছে ২৫০টির বেশি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা আর এর তলায় আছে প্রায় আধ ডজন শক্তিশালী উপসংগঠন যেমন, 'দি ভেন্দেল' (de Wendel), 'মেরিন এট্ হোমকোর্ট' (Marine et Homecourt), শ্নিডার (Schneider), 'লঙউই' (Longwy), 'দিভেন-আনজিন' (Devain-Anzin) ও 'নোর্দে স্ত' (Nord-Est)। ফরাসী দেশে যতো লোহা ও ইস্পাত তৈরি হয় তার ৪ ভাগের ৩ ভাগ তৈরি করতো এরা। এইসব কোম্পানি-

গুলির মোট পুঁজি ১৩০ কোটি টাকার ওপর। আর এই ১৩০ কোটি টাকা ছাড়া তাদের কোটি কোটি টাকা আছে যা এরা শুধু সুদে খাটায়। যে বছর এদের মোটামুটি ভালো লাভ হয় সে বছর এদের লাভের হিসেব দাঁড়ায় প্রায় ৬½ কোটি টাকা। অবশ্য এই ৬½ কোটি টাকা লাভের কথা এরা জানিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর যা লাভ হয় তার হিসেব এরা জনসাধারণকে জানায় না। এদের কল-কারখানায় লক্ষ লক্ষ ফরাসী শ্রমিক প্রাণপাত পরিশ্রম করে কিন্তু এর মাথায় আছে মাত্র ৩০ জন ডিরেকটর।

'কমিতি দেস্ ফর্জেস্' (Comite des Forges) ছাড়া কল-কারখানার মালিকদের আর বিশেষ বড়ো সংগঠনগুলির নাম হলো: 'কমিতি সেনত্রাল দেস্ হুলিআরস্' (Comite Central des Houillers) অর্থাৎ কিনা খনির মালিকদের সংগঠন, যার জন্ম হয় ১৮৯২ সালে। খনির মালিক আর লোহা ইস্পাত কারখানার মালিকরা ১৯০০ সালে মিলেমিশে একটি সংগঠন তৈরি করে আর তার নাম দেয় 'ইউনিয়ন দেস্ ইনদাস্ত্রিস্ মেটালার্জিকস্ এট্ মিনিয়ার্স' (Union des Industries Metallargiques et Minieres) আর জাহাজ কোম্পানির মালিকরা মিলে যে সংগঠন তৈরি করে ১৯০৩ সালে আর তার নাম দেয় 'কমিতি সেন্ত্রাল্ দেস্ আরমাতার্স দ্য ফ্ঁাস' (Comite Central des Aermateurs de France)।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কল-কারখানার মালিকরা দেখে যে, তাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী না করতে পারলে মুশকিল। তাই ১৯১৯ সালে তারা তৈরি করলো Confederation

Generale de la Production Francaise. অর্থাৎ কিনা বড়ো বড়ো কল-কারখানা-মালিকদের একজোট সংগঠন যার উদ্দেশ্য হলো পরস্পরের মধ্যে আরও বেশি সংযোগ সৃষ্টি যাতে সব রকমে লাভ আরও বাড়ে ও রাষ্ট্রের আইন, কানুন, শাসন ইত্যাদি এমনভাবে চালানো হয় যাতে মালিকদের কোনো ক্ষতি না হয়।

এই সংগঠনটির ৩০টি শাখা আছে, যেমন লোহা ও ইস্পাত শাখা, খনি, জাহাজ, রাসায়নিক, বস্ত্র, বীমা ইত্যাদি।

এই সংগঠনে ফরাসী দেশের কল-মালিক অথবা নিয়োগকর্তারা কী পরিমাণে অংশ গ্রহণ করেছিলো আর সমস্ত ফরাসী জাতীয় অর্থনীতির ওপর এই সংগঠনের কী পরিমাণ অধিকার ছিলো তার প্রমাণ আমরা পাই বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন থেকে। বস্ত্রশিল্পে যতো শ্রমিক কাজ করতো তার $\frac{৪}{৫}$ ভাগ শ্রমিক কাজ করতো এমন কলকারখানায় যাদের মালিকরা ছিলো এই সংগঠনের সভ্য ও তাঁবেদার।

সত্যি কথা বলতে কি, মালিকদের এই সংগঠনে ফরাসীদেশের নাম করার মতো প্রত্যেকটি মালিকই সামিল ছিলো। এই সংগঠনের মধ্যবর্তী কমিটির সভা বসতো প্রত্যেক মাসে প্যারিস শহরে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা ও মালিকদের স্বার্থ রক্ষার উপায় হতো এই সভার আলোচ্য।

মালিকদের এই সংগঠনটি হলো শিল্পপতিদের জোট বাঁধার একটি বিরাট নিদর্শন আর ফরাসী দেশে এর ক্ষমতা কতো তা অনুমান করা যায় এই থেকে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই দেশের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে

দিয়েছিলো শিল্পপতিদের এই সংগঠনটি।

যেমন মার্কিন দেশে তেমনি ফরাসী দেশেও শিল্পপতিদের জোট বাঁধা ও একচেটিয়া মালিকানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের হাতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ঘনীভূত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক হলো : ১। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স ২। Credit Lyoumais ৩। Societe Generale ৪। Credit Industrial et Commercial ৫। Complain National d' Escompte de Paris। এই বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশ কর্মকর্তা হলেন ফরাসী দেশের ইস্পাতশিল্প, বৈদ্যুতিক সংগঠন, রেল কোম্পানি প্রভৃতির মালিকদের প্রতিনিধি।

এই ব্যাঙ্কগুলি ফরাসী দেশের সরকারকে নিজেদের ইচ্ছেমতো চালাতে পারে ও চালায় এইজন্যে যে, সরকারের টিকি বাঁধা এদের হাতে। সরকারের টাকা-পয়সা, লেনদেনের ব্যাপারে এই ব্যাঙ্কগুলির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

১৮৭০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ফরাসী দেশের জাতীয় দেনা ১১৫১৬০০০০০০ ফ্রাঙ্ক থেকে বেড়ে যায় ২৫৮৩৯০০০০০০ ফ্রাঙ্কে সরকার এই টাকা দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে ধার করে। এ-কথা সহজেই বোঝা যায় যে, এই টাকার অধিকাংশটাই আসে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে। এর থেকেই বুঝতে পারো, ফরাসী সরকারের পক্ষে এই বড়ো ব্যাঙ্কগুলির অবাধ্যতা করা কতো শক্ত। তাছাড়া এই বড়ো ব্যাঙ্কগুলির কথা ভেবে দেখো :

যতোই সরকারি দেনা বাড়ছে ততোই বাড়ছে এই ব্যাঙ্কগুলির পাওনা সুদের অঙ্ক। কাজেই এ যেন এক ঢিলে দু পাখি মারা। ক্ষমতাকে ক্ষমতাও হাতে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে বহু টাকা সুদে খাটিয়ে এলো প্রচুর লাভ।

আজকের দিনে দেখা যায়, ফরাসী দেশের বড়ো বড়ো ২০০ পরিবার দেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ওপর কর্তৃত্ব করছে এবং সরকারকে চালাচ্ছে।

এদের ক্ষমতার একটি বিরাট কেন্দ্র হলো ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স যার উল্লেখ আগেই করেছি। এই ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স স্থাপন করেছিলেন নেপোলিয়ন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর কতো ঝড়ঝাপটা ফরাসী দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, কতো পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স অটল। তার কারণ এই যে, ফ্রান্সের কোটিপতি মালিক ও পুঁজিপতিরা এই ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের নিয়মকানুন এমন করেছে যে, যাই হোক না কেন ব্যাঙ্কের ওপর আসল কর্তৃত্ব এদের হাতেই থাকবে—তা যে সরকারই আসুক না কেন, যে পরিবর্তনই হোক না কেন। সরকারের সিন্দুকের চাবিটি থাকবে এদের জিম্মায়। ব্যাপারটা কী রকম দেখো। নিয়ম হলো, কাউন্সিল অব রিজেণ্টস্ নামে ১২ জনের একটি সংগঠন এই ব্যাঙ্কের সমস্ত তত্ত্বাবধান করবে। এই কাউন্সিলের যিনি সভাপতি তাঁকে ও আর দুইজন সভ্যকে ফরাসী সরকার মনোনীত করবেন। এ ছাড়া বাকি সভ্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৬ জন সভ্য হওয়া চাই বিভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিনিধি। এই ৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন আবার ২০০ জনের একটি কমিটি থেকে এবং ২০০ জনের কমি-

প্রকৃতি কৃপণা নয়।

সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ গতর খাটাতে মাথা খাটাতে নারাজ নয়।

তবে অনাহার অল্পাহার কেন?

বেশির ভাগ মানুষের জীবনে অস্বচ্ছলতা কেন?

৮৪ থেকে ৯৫—এই কটি পাতায় কয়েকটা ম্যাপ ছাপা হয়েছে। সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখো। ম্যাপের নিচের লেখাগুলোকে মন দিয়ে পড়ো।

কী দেখবে? কী বুঝবে?

সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ মাটির বুকে যে-ফসল ফলায়, অন্ধকার খনিগর্ভ থেকে যে-সম্পদ বের করে নিয়ে আসে, তাতে এতো অভাব এতো অস্বাচ্ছন্দ্য হবার কথা নয়।

কিন্তু—

সেই ফসল সেই সম্পদ সব মানুষের জীবনকে স্বচ্ছল করে তোলার কাজে না লেগে,

জনাকয়েক মানুষের টাকার সিন্দুককে ভারি করে তোলে।

এই ব্যবস্থা ভালো নয়।

এই ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া উচিত।

এই ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া যায়।

পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এই ব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে।

কী করে?

তারা করছে কী?

তাদের কথা বলা হয়েছে এই বইয়ের শেষের দিকে।

আর বাকি দু ভাগ মানুষ?

তারা হাত গুটিয়ে বসে নেই।

তারা লড়ছে।

মালয়ে, কেনিয়ায়, গিয়ানায়।

তারা জিতছে।

ইন্দোচীনে।

শেষ পর্যন্ত সবাই-ই জিতবে।

গোটা পৃথিবীই সুন্দর হবে।

সম্পদে সমৃদ্ধ হবে।

সংগীতে মুখর হবে।

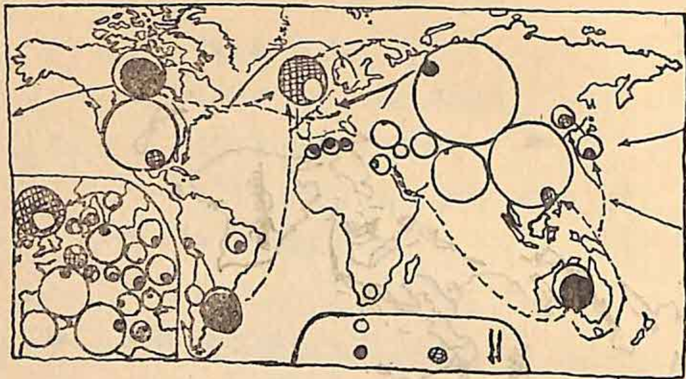
এসো,

সেই আশায় আমরাও বুক বাঁধি,

হাতে হাত বাঁধি।

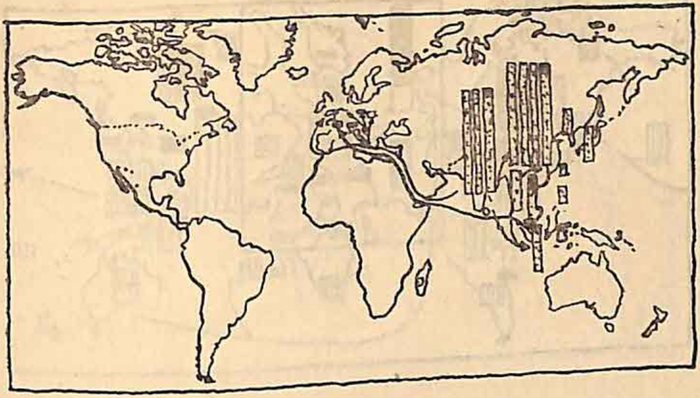


পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ



গম

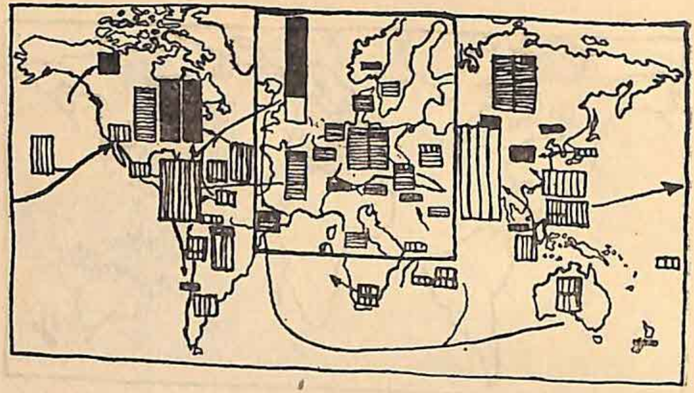
পৃথিবীতে যতো খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তার মধ্যে গম আর চাল সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। মানুষ জাতির তিন ভাগের এক ভাগের প্রধান খাদ্য গম। গমের চাষ সবচেয়ে বেশি হয় সোবিয়েত ইউনিয়নে, তারপর মার্কিনদেশে। চীনদেশে ও ভারতেও গম হয় প্রচুর। আমাদের দেশে যতো গম উৎপন্ন হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে। পাঞ্জাবের উৎপন্ন গম ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ। পৃথিবীতে ১৯৪৮-৫০ সালে গড়ে মোট গম উৎপন্ন হয় ১৯১,৭০২,০০০ টন। এককালে আমাদের দেশে যা গম উৎপন্ন হতো তাতেই আমাদের চলে যেতো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এমনি মহিমা যে গত কয়েক বৎসর ধরে আমাদের গম আমদানি করতে হচ্ছিলো। ছবিতে দেখো : যে সব দেশে গম উৎপন্ন হয় সেগুলি বৃত্তাকারে দেখানো হয়েছে। বৃত্তের মধ্যে যেখানে কালো দাগ সেই দেশগুলি গম রপ্তানি করে থাকে। আর যেখানে কালো ছক সেইগুলি গম আমদানি করে। ইংল্যাণ্ডের গম আমদানির বহরটা লক্ষ্য কোরো।



চাল

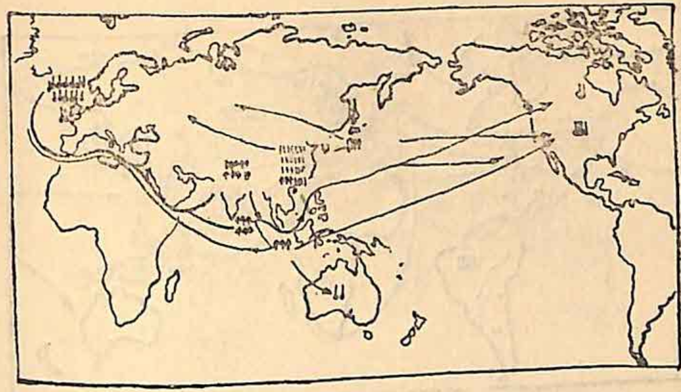
এশিয়া মহাদেশের পক্ষে গমের থেকেও জরুরী চাল। মানুষ জাতির প্রায় অর্ধেকের প্রধান খাদ্য চাল। পৃথিবীতে যতো চাল উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৯৬ ভাগই হয় এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো চীনদেশ, তারপর ভারতবর্ষ। শতাব্দী-ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ফলে এশিয়ার এই দেশগুলিতে কিন্তু খাদ্যের অভাব চিরন্তন এবং প্রায় সব দেশগুলিকেই কিছু কিছু চাল আমদানি করতে হয়।

১৯৪৮-৫০ সালে পৃথিবীতে মোট চাল উৎপন্ন হয় ১৫০৮০৬০০০ টন। এর শতকরা ৩০ ভাগ উৎপন্ন হয় চীনদেশে ও শতকরা ২০ ভাগ হয় আমাদের দেশে। গঙ্গানদীর উপত্যকাই ধান চাষের সবচেয়ে উপযোগী। ছবিতে দেখানো তীর-চিহ্নগুলি লক্ষ্য করলে দেখবে, কোথাকার চাল কোথায় যাচ্ছে।



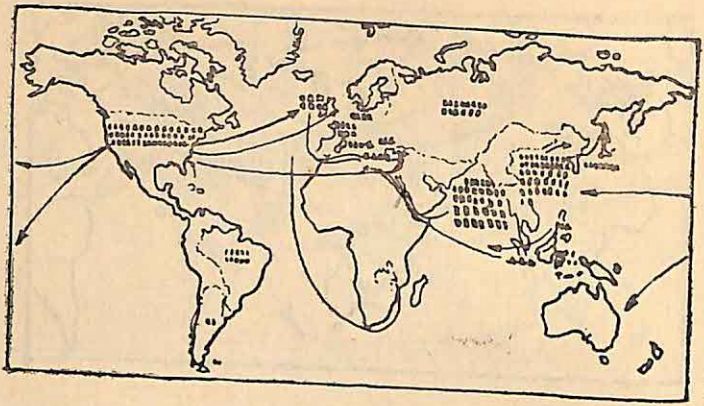
চিনি

এককালে হয়তো কেবল মাত্র বড়োলোকদের কপালেই চিনি জুটতো। দেহের উপযুক্ত পুষ্টির জন্যে কিন্তু কিছুটা চিনির প্রয়োজন। তাই আজ চিনি উৎপাদন পৃথিবীর একটি বিশেষ জরুরী শিল্প। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গমের পরেই আসে চিনি। ১৯৪৮-৫০ সালে পৃথিবীতে গড়ে মোট চিনি উৎপন্ন হয় ৩৪৩৮৬০০০ টন। চিনি উৎপাদনের জন্যে দরকার আখ কিংবা বিট। পৃথিবীর সবথেকে বেশি চিনি তৈরি হয় কিউবায় (দক্ষিণ আমেরিকা)। আমাদের দেশে চিনি উৎপাদনের কেন্দ্র উত্তর প্রদেশ। কিউবার পরেই আমাদের দেশের স্থান। আমাদের দেশে চিনি যথেষ্ট উৎপন্ন হলেও দাম কমাতে বেগ পেতে হয় এই জন্যে যে চিনি শিল্প প্রায় একচেটিয়া শিল্পে দাঁড়িয়েছে আর শিল্পপতিরা দেশের লোকের কাছে সস্তায় চিনি বিক্রি করার চেয়ে চিনি রপ্তানি করে মোটা লাভ করাকে জরুরী মনে করে। ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে চিনি রপ্তানির ব্যাপারটা দেখানো হচ্ছে।



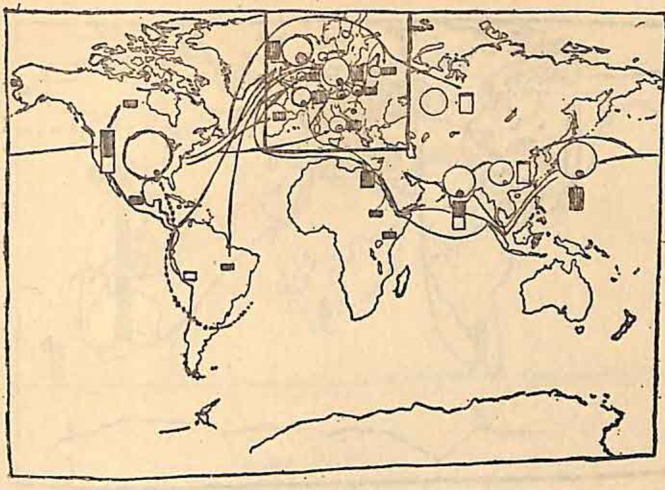
চা

চা প্রথমে সুদূর প্রাচ্যেই চালু ছিলো। এখন অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গাতেই চায়ের আদর। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক চা খায়। চায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কফি বা কোকা কেউই পেরে উঠে না। চীনদেশে ও ভারতবর্ষে চা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর উৎপাদনের তা প্রায় ৭০ ভাগ। এর প্রথম স্থান চীনদেশের ও দ্বিতীয় ভারতবর্ষের। আমাদের দেশে যে চা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৭০ ভাগই চালান হয় বাইরে। ১৯৪৮-৫০ সালে পৃথিবীতে চা উৎপাদনের গড়পড়তা হিসেব ৮৪৫০০০ টন। সিংহল চা উৎপাদনের একটি বড়ো কেন্দ্র এবং উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগই রপ্তানি হয়।



তামাক

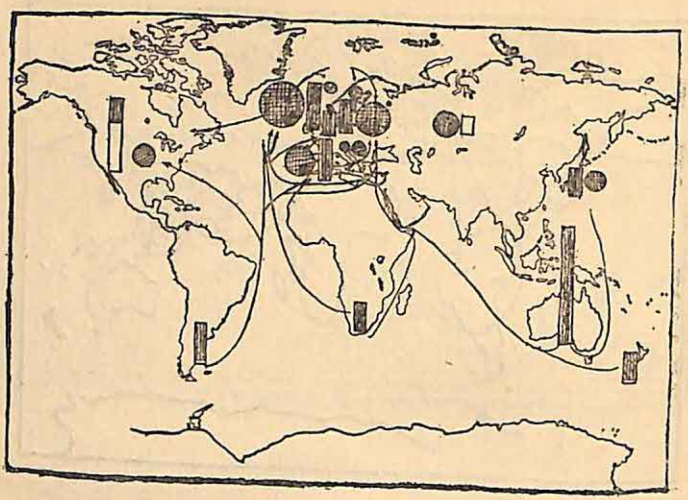
তামাকের আদর সব দেশে। ১৯৪৮-৫০ সালে পৃথিবীতে গড়-পড়তা মোট তামাক উৎপন্ন হয় ৩২৪০৯৭১ টন। এর মধ্যে সবথেকে বেশি উৎপাদন হয় মার্কিনদেশে, তারপর চীনদেশে ও ভারতবর্ষে। খইনি বা নস্যি তৈরি করার উপযোগী তামাক হয় দক্ষিণাঞ্চলে। আমাদের দেশের তামাক বিশেষ রপ্তানি হয় না। রপ্তানির ব্যাপারে মার্কিনী তামাকই প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা করে। তামাকের ব্যাপারে যা আন্তর্জাতিক লেনদেন তা সমস্তই মার্কিন ও ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির কবলে।



তুলো

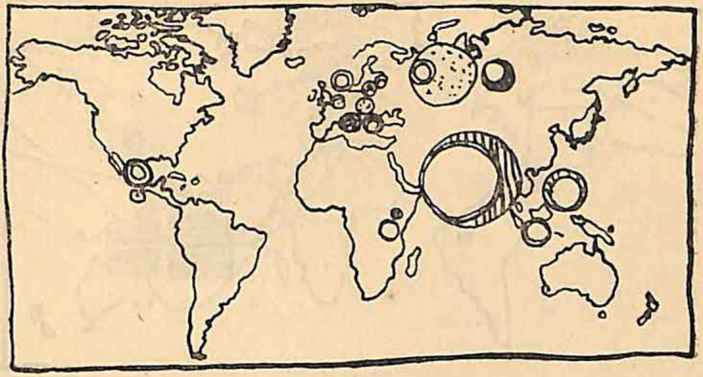
কাপড় ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে তুলোই সবথেকে বেশি কাজে লাগে এবং পৃথিবীর আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তুলোর আমদানি-রপ্তানি একটি বিশেষ জরুরী স্থান অধিকার করে আছে। তুলোকে তাই "শ্বেত স্বর্ণ" আখ্যা দেওয়া হয়। পৃথিবীতে যতো তুলো উৎপাদিত হয় তার প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ হয় মার্কিনদেশে। মার্কিনদেশের পরেই স্থান সোবিয়েত ইউনিয়নের। তারপর আসে ভারতবর্ষ ও চীনদেশ। এ ছাড়া মিশর, ব্রেজিল, পাকিস্তান ও মেক্সিকোয় তুলোর ব্যাপক চাষ হয়। ১৯৪৮-৫০ সালে গড়ে পৃথিবীতে ৬৮৮৭০০০ টন তুলো উৎপাদিত হয়। ১৯৫০ সালে চীনদেশের হিসেব বাদ দিয়ে পৃথিবীতে মোট ৫৩২৫০০০ টন তুলোর সুতো উৎপাদন হয়।

তুলোর আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাজার মার্কিনদেশের তুলো ব্যবসায়ীদের কবলে। তার কারণ পৃথিবীর বাজারে যতো তুলো লেন-দেনের জন্যে আসে তার শতকরাই আসে মার্কিনদেশ থেকে। ভারতবর্ষ ও মিশর থেকেও যথেষ্ট তুলো রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষ থেকে যে তুলো রপ্তানি হয় তার আঁশ ছোটো। বড়ো আঁশের তুলোর জন্যে ভারতবর্ষকে বিভিন্ন দেশ থেকে তুলো আমদানি করতে হয়। ভারতে উৎপাদিত তুলোর শতকরা ৫ ভাগ লম্বায় ১ ইঞ্চির বেশি। বাকি সব এক ইঞ্চির কম।



পশম

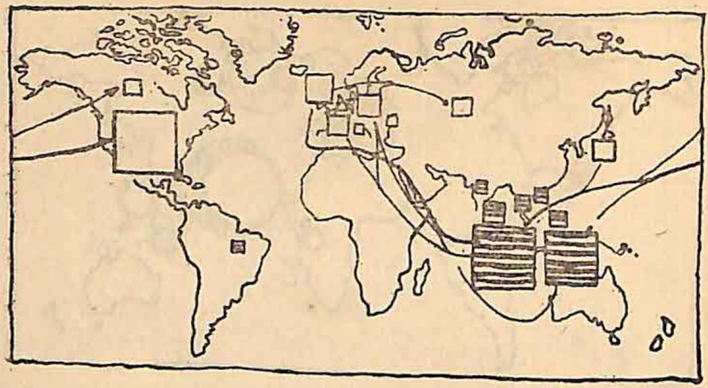
বস্ত্রশিল্পে তুলোর পরেই স্থান পশমের। ১৯৫০ সালে চীনদেশের হিসেব বাদ দিয়ে পৃথিবীতে মোট ১২৯৬০০০ টন পশমের সুতো তৈরি হয়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান হলো মার্কিনদেশের। এক কালে অষ্ট্রেলিয়াই ছিলো পশম-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৬ ভাগ আসতো অষ্ট্রেলিয়া থেকে। অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিনদেশ, আর্জেণ্টিনা ও নিউজিল্যাণ্ড মিলে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি পশম উৎপন্ন করে। ইংল্যাণ্ডে ও ফরাসীদেশে বড়ো বড়ো পশমের কারখানা আছে কিন্তু এই দুটি দেশকেই পশম আমদানি করতে হয় বাইরে থেকে। সোবিয়েত দেশে যা পশম উৎপন্ন হয় তা ঐ দেশের শিল্পেই ব্যবহৃত হয়।



শণ ও পাট

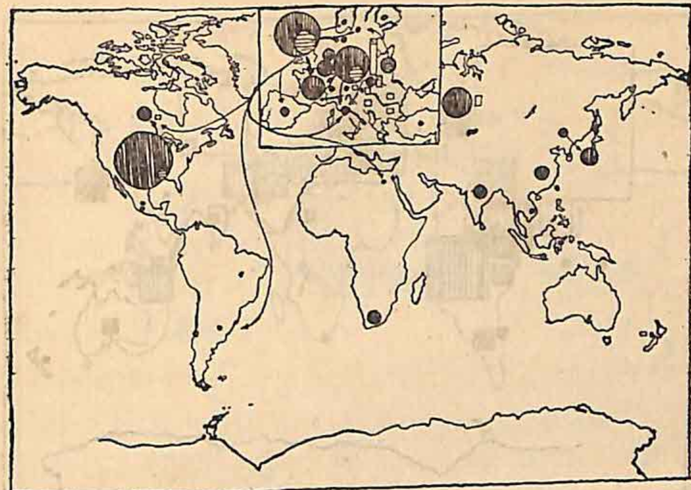
তুলোর আবির্ভাবের আগে বয়নশিল্পে শণই ছিলো সর্বাপেক্ষা জরুরী কাঁচা মাল। এখন একমাত্র সোবিয়েত দেশেই শণের চাষ বেশি হয়। এ ছাড়া পোল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়াতেও শণের চাষ হয়। পৃথিবীতে গড়ে ১৯৪৮-৫০ সালে ৮৮৪০০০ টন শণ উৎপাদিত হয় এবং এর শতকরা ৯০ ভাগই হয় সোবিয়েত দেশে।

থলি ইত্যাদি তৈরির জন্যে পাট বিশেষ জরুরী। প্রায় ৮০ বৎসর ভারতবর্ষই ছিলো পাটের বাজারের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু পাটশিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ পুঁজির কবলে থাকার ফলে কোটি কোটি টাকা বিদেশীরা দেশ থেকে লুটে নিয়ে গেছে আর ভারতের পাটের চাষীর কপালে জুটেছে দারিদ্র্য ও দুঃখ। ১৯৪৮-৫০ সালে গড়ে পৃথিবীতে বছরে ১৩২৯০০০ টন পাট উৎপন্ন হয় এবং এর শতকরা ৬০ ভাগ হয় পাকিস্তানে ও প্রায় ৩৭ ভাগ হয় ভারতবর্ষে।



রবার

মোটরশিল্পের বাড়তির সঙ্গে রবার পৃথিবীতে এক সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের পর্যায়ে এসেছে। মোটরশিল্প ছাড়াও রবার বিভিন্ন শিল্পে নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়। রবার কমপক্ষে ৫০০০০ বিভিন্ন কাজে লাগে। রবার উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হলো মালয়দেশ ও তার পরেই ইন্দোনেশিয়া। সাম্রাজ্যবাদের কী মহিমা দেখো। মালয়ের ধনসম্পদ রবার কিন্তু তার মালিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ইন্দোনেশিয়ায় ধনসম্পদ রবার কিন্তু তার মালিক ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ। আর যেহেতু মোটর শিল্প সব থেকে উন্নত মার্কিন দেশে তাই রবারের চাহিদা মার্কিন দেশেই সবথেকে বেশি। মালয়ের বা ইন্দোনেশিয়ার চাষীর কপালে শুধু দুঃখ আর এদের লুটে সাম্রাজ্যবাদ কী লাভ করে তার প্রমাণ পাবে একটি উদাহরণে : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা ধার করে আর এই ধার শোধ দেয় মালয়ের রবার-চাষী ও রবার-খেত। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে মালয়ের রবার-খেত ও রবার-চাষীকে লুট করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছে মোট লাভ হিসাবে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু মালয়বাসী দিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সিন্দুকে ১০০০ টাকা। ১৯৪৮—৫০ সালে পৃথিবীর ৩ বছরে গড়পড়তা রবার উৎপাদন হয় ১৬২৩০০০ টন। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই হয় মালয়ে ও ইন্দোনেশিয়ায়।

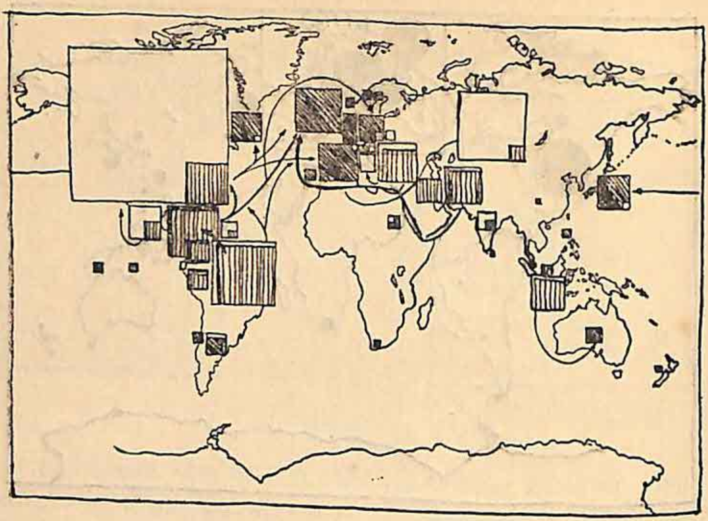


কয়লা

আজকের শিল্পসভ্যতার বুনিয়াদ কয়লা। ইন্ধন ও শক্তি-উৎপাদক হিসেবে এর স্থান সকলের ওপরে। পৃথিবীতে যতো শক্তি উৎপাদিত হয় তার $\frac{২}{৩}$ ভাগ আসে কয়লা থেকে। আজকাল অবশ্য কয়লার বদলে শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে পেট্রল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। পৃথিবীর খনিজ শিল্পের ৪৫ ভাগই অধিকার করে আছে কয়লা।

১৯৪৯-৫১ সালের হিসেবে বছরে গড়ে পৃথিবীতে মোট ১৩৮৮০০০০০০ টন কয়লা উৎপন্ন হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, মার্কিনদেশ ও সোবিয়েত ইউনিয়নে যা মোট কয়লা উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কয়লার তা প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ।

আমাদের দেশে যে কয়লা উৎপন্ন হয় তার সবই হয় বিহার প্রদেশের কয়লার খনিগুলিতে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভালো কয়লার খনিগুলি ব্রিটিশ পুঁজির কবলে।

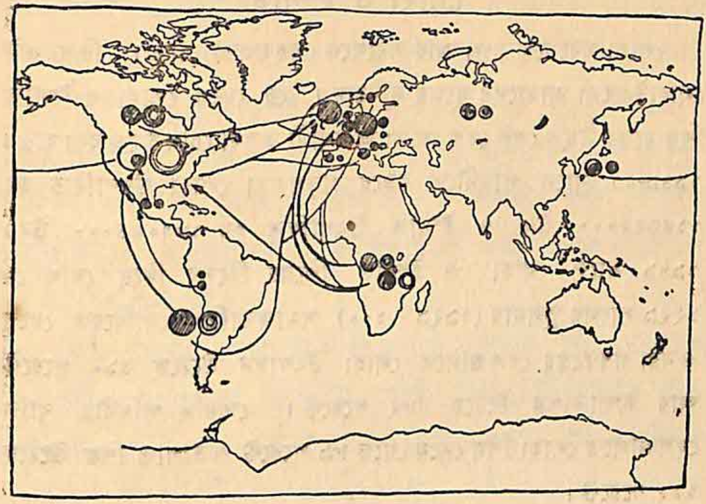


পেট্রলিয়াম

তরল ইন্ধনের মধ্যে পেট্রলিয়াম সবথেকে জরুরী। পৃথিবীর খনিজ-শিল্পের শতকরা ২০ ভাগ নিয়োজিত আছে পেট্রলিয়াম সংগ্রহে। পেট্রলিয়ামের সামরিক প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট।

পৃথিবীতে ১৯৪৯-৫১ সালে বছরে গড়ে ৫৩৬০০০০০০ টন পেট্রলিয়াম উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে বেশি হয়েছে মার্কিনদেশে এবং তারপর হয়েছে সোবিয়েত দেশে।

আমেরিকার পেট্রলিয়াম শিল্প বিরাট একচেটিয়া শিল্প এবং এদের কবলেই আছে মেক্সিকো, কলম্বিয়া, পেরু, আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলা, ইরাক প্রভৃতি দেশের পেট্রলিয়াম শিল্প।



তামা

লোহার পরেই শিল্পের পক্ষে সবথেকে জরুরী ধাতু তামা। পৃথিবীর তামা শিল্পের মোটা ভাগ মার্কিনদেশের পুঁজিপতিদের কবলে।

১৯৪৯-৫১ সালে বছরে গড়পড়তা তামার উৎপাদন হয় ২৪০৭০০০ টন। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হয় মার্কিনদেশে এবং তার পরেই হয় চিলিতে।

তামার আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যবসা মার্কিন পুঁজিপতিদের কবলে এ কথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় পেতে গিয়েই দেখেছো। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ তামা কি রকম ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবলে যাচ্ছে তা ছবির তীর-চিহ্নগুলি দেখলেই বুঝবে।

লোহা ও ইস্পাত

লোহা সবথেকে সস্তা আর সবথেকে সহজলভ্য ধাতু। কিন্তু এই লোহাই হলো আমাদের যুগের বুনিয়াদ। যে দেশে লোহা ও ইস্পাত শিল্প যতো উন্নত সেই দেশ ততো অগ্রগামী একথা চোখ বুঁজে বলা যায়। ১৯৪৯-৫১ সালে পৃথিবীতে বছরে গড়পড়তা লোহা উৎপাদিত হয় ১১৫৬৫২০০০ টন ও ইস্পাত উৎপাদিত হয় ১৮৭০৬৪০০০ টন। ১৯৪৯ সালে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের হিসেব নিয়ে দেখি যে ১২২৯ সালের তুলনায় (১৯২৯ = ১০০) সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত দেশে ও নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিতে লোহা উৎপাদন উঠেছে ৪৯০ পয়েন্টে আর ইস্পাতশিল্প উঠেছে ৫৮২ পয়েন্টে। তেমনি পৃথিবীর বাকি দেশগুলিতে লোহা শিল্প নেমে গেছে ৮৯ পয়েন্টে ও ইস্পাত শিল্প উঠেছে ১১১ পয়েন্টে।

ভারতবর্ষে লোহা ও ইস্পাত শিল্প প্রধানত তিন জায়গায় : জামশেদ-পুরে টাটা কোম্পানির কারখানায়, বার্ণপুরে মার্টিন কোম্পানির কারখানায় ও মহীশূরের ভাণ্ডারবত্তী কারখানায়। আমাদের দেশে বছরে ১৮৭৮০০০ টন লোহা ও ১০৫০০০০ টন ইস্পাত তৈরি করা বর্তমানে সম্ভব।

টিতে থাকে মাত্র তারাই যাদের আছে বিরাট সম্পত্তি। তা ছাড়া নিয়ম হলো, কাউন্সিল অব রিজেন্টস-এর সভাপতি হওয়ার অধিকার থাকবে মাত্র এমন লোকের যার ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সে বেশ কিছু অংশীদারি আছে। অর্থাৎ ১২ জনের মধ্যে কমপক্ষে ৬ জন ব্যাঙ্কের সভাপতি হবেন কোটিপতিরা নিজেরাই অথবা তাদের প্রতিনিধি। কাজেই কোটিপতিদের স্বার্থে এই সংগঠন চলবে এ আর বেশি কথা কী?

কিন্তু, যেমন ইংল্যাণ্ড বা মার্কিনদেশে তেমনি ফরাসীদেশেও একচেটিয়া মালিকরা নিজেদের দেশে টাকা খাটিয়ে লাভ করে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদের চাই সস্তায় মাল, কম মজুরিতে শ্রমিকের গতর বিক্রি করার এমন বাজার যেখানে প্রতিযোগিতার বিশেষ ভয় নেই। তাই তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার করার প্রাণপণ চেষ্টা।

গত শতাব্দীর শেষে টুনিস, টংকিং, আনাম ও কাম্বোডিয়া (এখনকার ফরাসী ইন্দোচীন) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ দখল করে। ১৮৯০ সালে অধিকার করে ম্যাডাগ্যাসকার। তারপর দশ বছরের মধ্যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্য ছড়ায়। যথা—ডাহোমি, টিমবাকটু, সেনেগাল ইত্যাদি জায়গায়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে ফরাসী দেশের উপনিবেশ-সমূহের লোকসংখ্যা বেড়ে যায় ৬০ লক্ষ থেকে ৫০ কোটি ৬০ লক্ষে।

ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিকাংশই হলো উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায়। মোট ফরাসী সাম্রাজ্যের তুলনায় উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় ফরাসী

সাম্রাজ্যের আয়তন প্রায় শতকরা ৮১ ভাগ ও জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ।

আফ্রিকার সাম্রাজ্যের পরই হলো ইন্দোচীন। ফরাসী সাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২০ জন হলো ইন্দোচীন-বাসী।

ফরাসী সাম্রাজ্যের মোটামুটি হিসেব এই রকম দাঁড়াবে (হাজারের হিসেবে) ফরাসীদেশ : ২৪২·৭ বর্গমাইল ; টুনিস : ৪৮·৩ বর্গমাইল ; আলজেরিয়া ; ৮৪৭·৬ বর্গমাইল ; ফরাসী মরক্কো : ২০০·০ বর্গমাইল ; ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা : ১৮১৯·৭ বর্গমাইল ; ফরাসী মধ্য আফ্রিকা : ৮৭১·০ বর্গমাইল। ম্যাডাগ্যাসকার : ২৪৩·৪ বর্গমাইল ; ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড : ৮·৯ বর্গমাইল ; ভারতবর্ষে ফরাসী রাজ্য : ০·২ বর্গমাইল ; ফরাসী ইন্দোচীন : ২৭৭·৫ বর্গমাইল ; আমেরিকায় ফরাসী ঘাঁটি : ০·৮ বর্গমাইল ; দক্ষিণ আমেরিকায় ফরাসী অধিকৃত জায়গা : ৩৫·১ বর্গমাইল ; অষ্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ : ৮·৬ বর্গমাইল ; লেভাণ্ট রাজ্যসমূহ (তুরস্কের পাশে) : ৫৭·৯ ; প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপপুঞ্জ (ওশেনিয়া) : ১·৫ বর্গমাইল ; অষ্ট্রেলিয়ার কাছে নিউ হেব্রেডিস দ্বীপপুঞ্জ (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে দ্বৈতশাসন) : ৫·৭ বর্গমাইল।

এই সবের মোট হিসেব কতো বড়ো দাঁড়ায় দেখো : মোট বর্গমাইল দাঁড়ায় প্রায় ৪৮০০০০০ ও লোকসংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক ১০ কোটির ওপর। ইন্দোচীনের জাগ্রত স্বাধীনতাকামী মানুষ এই বিরাট সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে হারিয়ে দিয়েছে,

বাধ্য করেছে ফরাসী সাম্রাজ্যকে সন্ধি করতে, পিছু হটতে, শান্তির কথা বলতে। ইন্দোচীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসী ভারতবর্ষের জনসাধারণ আওয়াজ তুলেছে 'ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো'। আজ তাই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ থেকে পাততাড়ি গুটোতে আরম্ভ করেছে।



ছোটো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ

আজকের পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব দরকার, এ-কথা আমরা সকলেই জানি। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে এমন কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করো, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাষ্ট্র বলতে আমরা কাদের বুঝি, তবে উত্তর পাবে— আমেরিকা, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চীন। এতোক্ষণ আমরা এই ৫টি বড়ো বড়ো শক্তিগুলির মধ্যে তিনটির পরিচয় দিয়েছি। পরে সোবিয়েত দেশ ও চীন দেশের কথা বলব। যে তিনটি শক্তির পরিচয় আমরা নিয়েছি তারা সকলেই হলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। কিন্তু বড়ো ক্যাঙারুর পেটের থলিতে যেমন বাচ্ছা ক্যাঙারু বসে থাকে, তেমনি বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে ছোটো ছোটো সাম্রাজ্যবাদও বেঁচে থাকে। এই সব বাচ্ছা সাম্রাজ্যবাদের দাপট কিন্তু তাই বলে কম নয়। বরং পেছনে একটি বড়ো সাম্রাজ্যবাদ আছে এবং নেহাত বিপদে পড়লে সে আমাদের সামলাবে—এই ভরসায় মাঝে মাঝে এই বাচ্ছা সাম্রাজ্যবাদীরা হিংস্রতায় সমস্ত সীমা ছাড়ায়। জনসাধারণের ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকলেও— দাঁত খিঁচিয়ে, আস্তিন গুটিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সে লড়াইয়ে নামতে চেষ্টা করে। আমাদের এই ভারতবর্ষের মাটিতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাণ্ডকারখানাটা দেখলেই কথাটা বেশ বোঝা যায়। কোন সাহসে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ভারতের মাটিতে

তাদের সাম্রাজ্য চালিয়ে যাবার ভরসা রাখে? কোন সাহসে তারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের ক্রুদ্ধ দাবিকে উপেক্ষা করার ভান করে?

তাদের ভরসা এই যে, তাদের পেছনে আছে ব্রিটিশ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। আর তারা মনে করে যে, ভারত সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সহজে কিছু করতে সাহস করবে না। তাই না পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের এতো দাপট!

বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও এই অবস্থা বোঝে এবং অনেক সময় বাচ্চা সাম্রাজ্যবাদীদের দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয়। ভারতবর্ষের পর্তুগীজ-শাসিত অঞ্চলগুলি তো আজ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে, গোলা-বারুদে ভর্তি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে ভারতবর্ষকে ভয় দেখানোর জন্যে বাচ্চা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবহার করছে, এ-কথা তো আজ আর কারুর অজানা নেই!

এই সব কারণে আমাদের আজকের পৃথিবীকে বুঝতে হলে বাচ্চা সাম্রাজ্যবাদীদেরও এক ঝলক পরিচয় নিয়ে নিতে হবে।

॥ বেলজিয়ান সাম্রাজ্য ॥

ইউরোপের ছোট্ট দেশ বেলজিয়ম। আয়তন ১১৮০০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা আনুমানিক ৯০ লক্ষ। এই ছোট্ট বেলজিয়মের মধ্য আফ্রিকায় যা উপনিবেশ আছে তা বেলজিয়ম দেশের থেকে আট গুণ বড়ো। এই উপনিবেশ-এলাকার নাম বেলজিয়ান কঙ্গো ও এরই সঙ্গে যুক্ত রুয়ান্দা-উরুন্দী এলাকা।

এই উপনিবেশ-এলেকার আয়তন ৯ লক্ষ ৪১ বর্গমাইলের বেশি এবং লোকসংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ।

তা হলেই দেখছো যে, দেশের তুলনায় দেশের উপনিবেশ আয়তনে ও লোকসংখ্যায় কতো বড়ো। এই উপনিবেশের সমস্ত বাসিন্দা হলো জাতিতে নিগ্রো।

॥ ওলন্দাজ সাম্রাজ্য ॥

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় হল্যাণ্ড দেশ বেলজিয়ম দেশের প্রায় সমান-সমান। সাম্রাজ্যের আয়তনের দিক থেকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য বেলজিয়ান সাম্রাজ্যের চেয়ে সামান্য ছোটো। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যে লোক বেশি অন্তত ৫ গুণ।

আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়া অন্য সমস্ত মহাদেশেই ওলন্দাজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত : অধিকাংশই হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও ও অষ্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জগুলিতে। যথা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকায় ওলন্দাজ গিয়ানায় ও কুরাকায়ো-এ ওলন্দাজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

ওলন্দাজ সংস্কৃতি বহু জায়গায় ছড়িয়েছে। বেলজিয়মের অধিকাংশ লোক ওলন্দাজ ভাষায় কথায় বলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োরদের নাম হয়তো শুনেছো। এরাও ওলন্দাজদের বংশধর এবং এখনো ওলন্দাজ ভাষায় কথা বলে। ওলন্দাজ ভাষার দক্ষিণ আফ্রিকায় নাম হয়েছে আফ্রিকানস্।

ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যার হিসেব এই

রকম দাঁড়ায় :—

হল্যাণ্ডের আয়তন ১৩২০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা (আনু-মানিক) ৯০ লক্ষ।

উপনিবেশসমূহের মোট আয়তন ৭৮৮৪০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা (আনুমানিক) ৭ কোটি। কাজেই মোট দাঁড়াচ্ছে : আয়তনে ৮০১৬০০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যার হিসেবে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ।

ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহের জনসাধারণ জাতিতে প্রধানত মালয়ী। মালয়ীরা ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহের লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ। এ ছাড়া চীনাজাতীয় লোকও যথেষ্ট।

॥ ড্যানিশ সাম্রাজ্য ॥

ডেনমার্ক দেশটি ছোটো। আয়তন মাত্র ১৬৬০০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪৫ লক্ষ। কিন্তু ডেনমার্কের অধীনে রয়েছে পৃথিবীর সব থেকে বড়ো দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড এবং ক্যারো দ্বীপপুঞ্জ। গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপটি আয়তনে বড়ো হলেও জনবিরল। গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপের আয়তন ৮২৭৩০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা (আনুমানিক) মাত্র ২৫ হাজার। ক্যারো দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ৫০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা (আনুমানিক) ৩৫ হাজার।

॥ পর্তুগীজ সাম্রাজ্য ॥

দুশো বছরের পুরনো ইংলণ্ড-পর্তুগাল একটি চুক্তির জোরে

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ আজও বেঁচে আছে। আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য পর্তুগাল দেশের চেয়ে অনেকগুণ বড়ো। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রধান ঘাঁটি আফ্রিকায়। এশিয়ায় পূর্বের বিরাট পর্তুগীজ সাম্রাজ্য আজ আর নেই, আছে তার কিছু সামান্য ভগ্নাবশেষ। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশে বহুদিন পর্যন্ত পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ ছিলো, তাই আজও সেখানে পর্তুগীজ ভাষা ও সংস্কৃতি বেশ বড়ো স্থান অধিকার করে আছে।

পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের লোকসংখ্যার অধিকাংশই নিগ্রো জাতি।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্য নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিস্তৃত :— এ্যাজোরেস ও ম্যাড়েইরা দ্বীপপুঞ্জ। কেপ ভেরত্‌ড, সাওলাম ও ও প্রিন্সিপি দ্বীপপুঞ্জ (আফ্রিকার পাশে)। আফ্রিকায় পর্তুগীজ গিনিয়া। পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকা বা এ্যানগোলা। পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকা বা মোজামবিক। ভারতের পর্তুগীজ-অধিকৃত এলাকা। পূর্ব এশিয়ায় ম্যাকাও। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে টিমোর দ্বীপপুঞ্জ।

আয়তনে পর্তুগীজ দেশ ৩৪৩০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আনুমানিক ১ কোটির কাছাকাছি। কিন্তু উপনিবেশ সমূহের মোট আয়তন ৯৩৭৪০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি।



যুদ্ধ কেন?

পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে পরিচয় পেলে তা থেকে নিশ্চয়ই দেখলে, একের সঙ্গে অন্যের তফাত থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে অনেক মিল আছে। যেমন ধরো,

প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশেই দেখি, মুষ্টিমেয় কয়েকঘর কোটিপতি, কলকারখানা ও ব্যাঙ্কের মালিকরা, নিজের নিজের দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিরাট

শক্তি হিসেবে বেড়ে উঠেছে। কিংবা ধরো, প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই উপনিবেশ শোষণ করার জন্যে ব্যস্ত, কারণ উপনিবেশের কাঁচা মাল সস্তায় পাওয়া যায় আর উপনিবেশের শ্রমিক-কৃষককে অনেক অল্প খরচে খাটানো যায়, তাতে লাভ থাকে অনেক বেশি।

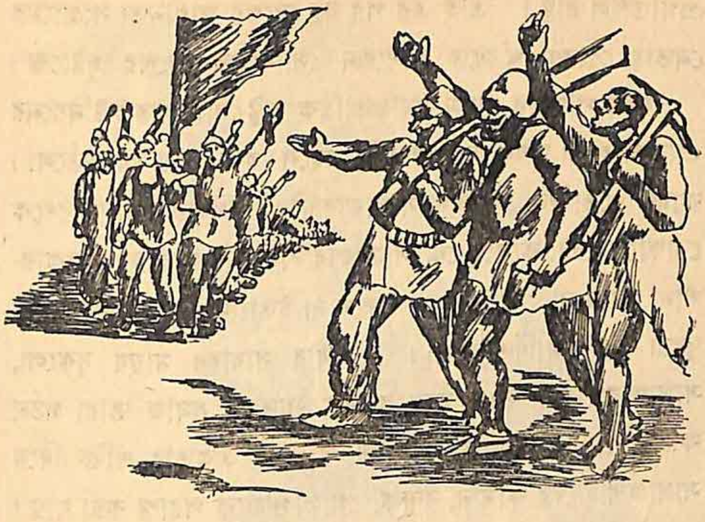
তুমি যদি বিলেতের ইউনিলিভার কোম্পানির মালিক হতে কিংবা যদি আমেরিকার রকফেলার গোষ্ঠীতে তোমার জন্ম হতো, তা হলে তুমি হয়তো দিবাস্বপ্ন দেখতে যে, পৃথিবীর যেন আর শেষ নেই—প্রত্যেক বছরেই একটা করে নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হচ্ছে আর প্রত্যেক বছরেই তুমি নতুন নতুন দেশে টাকা খাটিয়ে তোমার সম্পত্তি বাড়িয়েই চলেছো। হয়তো ভাবতে, 'আহা পৃথিবীর কাছে যে গ্রহ-উপগ্রহগুলি আছে তাতে যদি মানুষ থাকতো! আর যদি সেই গ্রহ-উপগ্রহগুলোর পেটের মধ্যে থাকতো কয়লা আর তেল কিংবা সেখানে যদি ফলতো পাট আর গম! তাহলে কী সুখেই না থাকতাম—কতো মানুষকে কলকারখানায় খাটাতাম, কতো দেশে খাটতো আমার টাকা, আর কী জোরেই না বেড়ে যেতো আমার মুনাফা! কোনো ঝামেলা থাকতো না!' গ্রহ থেকে গ্রহে ছড়িয়ে যেতো তোমার টাকা। তুমি বছরে একবার করে চাঁদে গিয়ে ঘুরে দেখে আসতে তোমার কারখানাটা কেমন চলছে কিংবা মঙ্গলগ্রহে তোমার যে খনিটা আছে সেটায় কাজ হচ্ছে কী রকম।

কিন্তু মুশকিল এই যে, পৃথিবীর একটা শেষ আছে। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে আর কোনো মহাদেশ আবিষ্কৃত

হলো না আর আপাতত চাঁদে বা মঙ্গলে কারখানা খোলাটা সম্ভব নয়। কাজেই বাধলো যতো গণ্ডগোল। ১৯১৪ সালে জার্মানির কোটিপতিরা বললো, ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স অধিকার করে বসে আছে যতো সব উপনিবেশ, আমাদের হাতে উপনিবেশ নেই! অথচ পৃথিবীতে নতুন জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই যদি মিষ্টি কথায় ইংল্যাণ্ডের বা ফ্রান্সের বড়োলোকেরা আমাদের উপনিবেশ না দেয় তবে গায়ের জোরে লড়াই করে উপনিবেশ ছিনিয়ে নেবো। এইভাবেই লাগলো ১৯১৭ সালের বিশ্বজোড়া প্রথম মহাযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও লাগলো এইভাবেই। জার্মানি, ইটালি আর জাপানের কোটিপতিরা ভাবলো, পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শেষ করে দিয়ে তারপর অন্যদের ঠাণ্ডা করা যাবে ডাণ্ডা মেরে। তারপর পৃথিবীজোড়া জমিদারি ভোগদখল করা যাবে। সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ শোষণ না করে বাঁচতে পারে না। আর উপনিবেশ দখল করার চেষ্টাতেই তারা লাগায় যুদ্ধ—কোটি কোটি মানুষকে মেরে, দেশমাটি পুড়িয়ে ছারখার করে তারা চায় নিজেদের আয় বাড়াতে, নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। তাই পৃথিবীর জনসাধারণ ক্রমেই বুঝছে যে, যদি চিরদিনের মতো যুদ্ধের আশঙ্কাকে মুছে ফেলতে হয় তবে সাম্রাজ্যবাদকে মুছে ফেলতে হবে।

তাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত লড়াই হলো পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির লড়াইয়ের সহায়ক। সোবিয়েত ইউনিয়নে বা চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করে মানুষ যে নতুন সমাজ গড়েছে, সেখানে রাষ্ট্র স্থাপন করেই তারা বলছে—আমরা সাম্রাজ্যবাদকে

আমাদের দেশে পরাস্ত করেছি। আমরা উপনিবেশের মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছি। আমরা মনে করি, মানুষকে শোষণ করা, অন্যের শ্রমে নিজের মুনাফা বাড়ানো, মহাপাপ। আমরা যুদ্ধের মরণপণ বিরোধী, কারণ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার, পৃথিবীর উপনিবেশগুলোকে ভাগবাঁটোয়ারা করার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ বাধায়। আমাদের নিশান তাই শান্তির নিশান, স্বাধীনতার নিশান, শোষণ শেষ হওয়ার নিশান। এই বিশ্বজোড়া স্বাধীনতার লড়াইয়ের কিছু পরিচয় এবার আমরা দেবো।



স্বাধীনতা ও শান্তির লড়াই

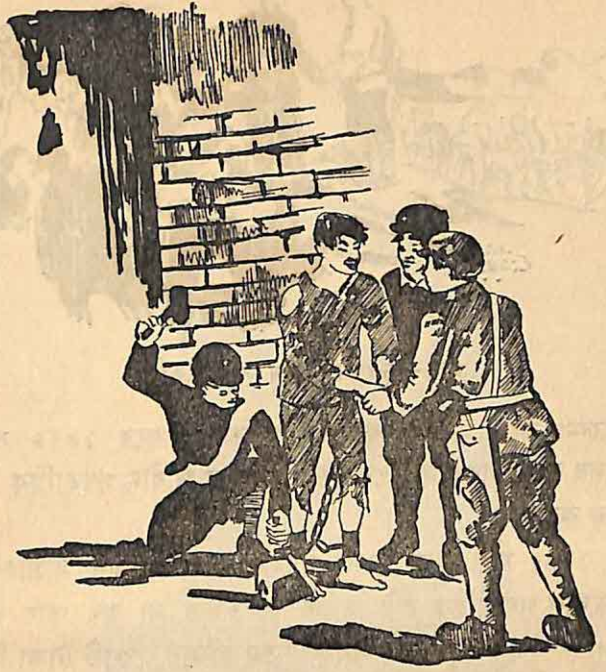
যে দিন থেকে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম সেইদিন থেকেই জন্ম স্বাধীনতার লড়াইয়ের। উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮২৫-৩০ সালে জাভার বিদ্রোহ; ১৮৫০-৬৪ সালে চীনদেশের তাইপিং বিদ্রোহ; ১৮৫৭-৫৯ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ; ১৮৮৩-৮৫ সালে আফ্রিকার দেশ সুদানের সংগ্রাম—স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় ঘটনা। তখনকার দিনে পৃথিবীতে সবথেকে প্রগতিশীল রাষ্ট্র বলতে বোঝাতো ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রকে। কাজেই উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা খুঁজতেন ইংল্যাণ্ডের বা ফ্রান্সের দৃষ্টান্তে। ১৯১৭ সালে জন্ম হলো সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত দেশের—পৃথিবীর সবথেকে

প্রগতিশীল রাষ্ট্র। তাই এর পর বহু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা প্রেরণা খুঁজতে লাগলেন সোবিয়েত দেশের দৃষ্টান্তে।

যখন পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হলো তখন সাম্রাজ্যবাদী মহলে হায় হায় রব উঠলো। কারণ এতোদিন এই কথা সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা না থাকলে কলকারখানা চলবে না, লোকে কাজ করবে না ইত্যাদি। সে-সব কথা ভুয়ো বলে প্রমাণিত হলো। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বুঝলো, সাম্রাজ্যবাদীদের খতম করে অনেক উন্নততর সমাজ তারা গঠন করতে পারে। বুঝলো, সাধারণ মানুষের একতার শক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কামান, বন্দুক, গোলাগুলিকে পরাস্ত করা যায়। দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার ডাকলো।

১৯৪৫ সালে যখন সোবিয়েত দেশ পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী জার্মান, ইতালিয়ান, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্ত আক্রমণ চুরমার করে ভেঙে দিলো তখন যেন পৃথিবীর সমস্ত দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত কূল ছাপিয়ে দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। কী বিরাট এই জাগরণ। কী বৃহৎ এই সংগ্রাম। কী উজ্জ্বল সোনালি সকালের আভাস এই বিশ্বজোড়া স্বাধীনতার লড়াইয়ে।





চীনা মুক্তিফৌজ জেল ভেঙে দেশপ্রেমিকদের মুক্তি দিচ্ছে

॥ চীনদেশে ॥

সাম্রাজ্যবাদ সব থেকে বড়ো আঘাত পেয়েছে চীনদেশে। ১৯৪৯ সালে চীন দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। ১৯১১ সালে চীনের জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। ১৯১৯ সালে এই সংগ্রাম ব্যাপক রূপ গ্রহণ করে। ১৯২৭ সালে এই সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চিয়াং কাই-শেক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করে। ১৯৩৭ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র চীনদেশকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে চীন



মাও—চু-তের প্রথম সাক্ষাৎকার

আক্রমণ করে। এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ১৯৪৯ সালে চীনের জনসাধারণ মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করলো।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার জন্যে ৩০০০০০০০০০০৲ টাকা অর্থাৎ তিন হাজার কোটি টাকা চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করে, কোটি কোটি টাকার গোলাবারুদ কামানবন্দুক পাঠায়, মার্কিন যুদ্ধবিদদের পাঠায় পরামর্শ দিতে। কিন্তু মাও সে-তুঙ আর চু-তের নেতৃত্বে চীনের গণতান্ত্রিক সৈন্য-দল সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের জয়যাত্রায়। চিয়াং কাই-শেক দেশ ছেড়ে পালিয়ে ফরমোসা দ্বীপে মার্কিন আশ্রয় গ্রহণ করে।

চীনের জনসাধারণের এই অবিস্মরণীয় জয়ে সমস্ত এশিয়া, সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষ নতুন উৎসাহে প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, চীন দেশে গণতন্ত্রের জয় পৃথিবীর রাজনৈতিক ভারসাম্য দিয়েছে চিরদিনের মতো বদলে: দাঁড়ি-পাল্লায় স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের দেশগুলির সংহত শক্তি গেছে অনেক বেড়ে।



মাও সে-তুঙ



॥ মালয়দেশ ॥

৬০ লক্ষ মানুষের দেশ। আয়তনে আসাম প্রদেশের থেকেও ছোটো। এই দেশে থাকে ৩০ লক্ষ চীনা, ২৮ লক্ষ মালয়ী আর প্রায় ৭ লক্ষ ভারতীয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে মালয় খুবই জরুরী। কারণ, ইংরেজ কোটিপতিদের ১৩০ কোটি টাকার পুঁজি মালয়ে খাটে—মালয়দেশের রবার-খেতে ও টিনের খনিতে। এই মালয়দেশে টাকা খাটিয়ে কোটিপতিরা লাভও পায় অনেক। প্রায় প্রতি বৎসর লভ্যাংশ দাঁড়ায় শতকরা ৬০ বা ৬৫। যে-বছর আরো ভালো সে-বছর লভ্যাংশ শতকরা ১০০ও হয়। এই দেশে শ্রমিক-চাষী মাসে গড়পড়তা উপায় করে ১২ টাকা। কাজেই লাভ যে আকাশস্পর্শী হবে এ আর আশ্চর্য কি!

ব্রিটিশ শাসন মালয়দেশকে বছরের পর বছর ছারখার করে চলেছে। শিশুমৃত্যুর হার কী ভয়ানক দেখো—১০০টি মালয়ী শিশুর মধ্যে ৫ বছর হবার আগেই ৪৫টি শিশু মারা যায়। ১০০টি মালয়বাসী চীনা শিশুর মধ্যে ৫ বছরের আগে মারা যায় ৩৮টি। আর ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের যারা মালয় দেশে খেটে খায় তাদের অবস্থা কী? ১০০টি শিশুর মধ্যে ৪৯টি শিশু মারা যায় ৫ বছরের আগেই।

এই নিদারুণ দারিদ্র্য ও গ্লানির বিরুদ্ধে মালয়বাসীর স্বাভাবিক বিদ্রোহেই মালয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম। ১৯৩১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৭ সালের মধ্যে মালয়দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্রুত গড়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালে দেশজোড়া হরতাল হয় এবং এতে কমপক্ষে ৫ লক্ষ মালয়বাসী যোগদান করে।

১৯৪১ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ মালয় আক্রমণ করে এবং অচিরে ইংরেজ শোষকের দল ভীরু কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। দীর্ঘ চার বৎসর অদম্য সাহসের সঙ্গে মালয়বাসী জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ হার স্বীকার করে। মালয়বাসীর নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া "জনসাধারণের জাপান-বিরোধী সেনাদল" সমস্ত মালয়দেশ থেকে জাপানীদের তাড়িয়ে স্বাধীন মালয় প্রতিষ্ঠিত করে।

ইংরেজ দস্যুর কাজ আরম্ভ হয় এর পর। সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সৈন্য মালয় পুনরধিকার করার অভিযান শুরু করে। স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্যে একের পর এক

আইন জারি হতে থাকে। যেমন—"রাজদ্রোহী" বক্তৃতা আইন, বহিষ্কার আইন, ছাপাখানা-সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। সমস্ত গণ-সংগঠন, যথা ট্রেড ইউনিয়ন, মেয়েদের সংগঠন, রাজনৈতিক দল—একের পর এক সবগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক তথাকথিত 'সংবিধান' চালু করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। এই 'সংবিধান' অনুসারে একটি আইন-প্রণয়ন-সভার ব্যবস্থা থাকে যদিও এই আইন-প্রণয়ন-সভায় একটিও নির্বাচিত প্রতিনিধির আসন থাকে না।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তাভজা ইউনিয়ন তৈরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু মালয়বাসীকে আর ধোঁকা দেবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছিলো না। তাই একের পর এক প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টাই বিফল হয়।

১৯৪৮ সালে সাম্রাজ্যবাদ তার সব মুখোস ফেলে দিয়ে মালয়বাসীর ওপর জানোয়ারের মতন হিংস্র আক্রমণ আরম্ভ করে। তথাকথিত বিশেষ জরুরী আইন চালু হয়। তিনমাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের নিজ স্বীকৃতি অনুসারে ৭০০০ লোককে জেলে ও অন্তরীণ ক্যাম্পে পোরা হয়। অসংখ্য লোক গুলিতে মরে।

সাম্রাজ্যবাদ যখন জনসাধারণকে এইভাবে আক্রমণ করে তখন জনসাধারণও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লড়াইয়ে নামে।

ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ যে-সমস্ত ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, বিমান ইত্যাদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার সুযোগ

পায়নি সেই সমস্ত সমরসম্ভার নিয়ে নিরস্ত্র মালয়বাসীর ওপর আক্রমণ শুরু করে। দস্যুরা ভেবেছিলো, আমাদের যখন এতো সমরসম্ভার তখন নিশ্চয়ই কয়েকমাসের মধ্যেই মালয়বাসীদের ঠাণ্ডা করে দেবো। আজ ৬ বছর হয়ে গেলো। মালয়বাসী অদম্য সাহসের সঙ্গে আজও যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

৭০০০০ ব্রিটিশ সৈন্য বছরের পর বছর মালয়দেশে স্বাধীনতার সংগ্রামকে রক্তস্রোতে ডোবানোর চেষ্টায় বিফল হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার নিজেই স্বীকার করছে যে, মালয়বাসীকে বশে আনার চেষ্টায় প্রতি বছর তাদের কমপক্ষে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ করে টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরে আসল খরচ হচ্ছে তাদের ১৩০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

৭০০০০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ছাড়া হাজার হাজার নেপালী গুর্খা সৈন্য ও অন্যান্য সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মালয়ে দস্যুতা চালাচ্ছে। তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ১৫০০০০-এর কম নয়।

এতো করেও যখন মালয়বাসীকে বশ মানাতে পারলো না তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিংসার সীমা ছাড়াতে দ্বিধা করলো না। ১৯৫০ সালের মার্চমাসে ব্রিটিশ সরকার নিজেই স্বীকার করলো যে সবশুদ্ধ কমপক্ষে ২০০০০ লোককে দ্বীপান্তরে বা জেলে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ বিমান বাহিনী গড়ে মাসে ৬৩৮ বার বিভিন্ন গ্রাম ও বসতি আক্রমণ করে চলেছে। গ্রামকে গ্রাম, ছোটো শহরকে ছোটো শহর পুড়িয়ে দিচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গ্রামের বা শহরের সমস্ত অধিবাসীকে—এমন কি দুধের শিশুটিকে পর্যন্ত—জেলে

পুরে তদন্ত চালাচ্ছে।

যুদ্ধের সময় নাতসিরা যেমন পোল্যাণ্ড দেশের লিডিস গ্রামকে ভস্মীভূত করেছিলো এবং প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীকে পুড়িয়ে মেরেছিলো, ব্রিটিশ ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে মালয়দেশের জেন্দারম গ্রামটিকে সেই রকম করে ভস্মীভূত করে, প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করে—বিদ্রোহী মালয়বাসীকে শিক্ষা দেবে এই আশায়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন এলাকার সমস্ত খাদ্য বাজেয়াপ্ত করে। দেশ-নেতাদের ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে,—এই ঘোষণা করে, মালয়বাসীকে জব্দ করার চেষ্টা করে। মালয় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা চিন পেঙকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে ব্রিটিশ সরকার ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করে। বোর্নিও দেশ থেকে ডায়াক-জাতীয় লোক এনে মালয়বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামায় ব্রিটিশ সরকার। (এই ডায়াক জাতি এখনও অসভ্য মানুষের স্তরে এবং জঙ্গলের লড়াইয়ে এদের পারদর্শিতা দেখা যায়)।

দীর্ঘ ৬ বছর এই বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে মালয়বাসী। অত্যাচারে তাদের মন ভাঙেনি, টাকার লোভে তারা পথচ্যুত হয়নি। ১৯৫১ সালের শেষে "মালয়বাসীর স্বাধীনতা বাহিনী" মালয়দেশের চার ভাগের তিন ভাগ জায়গা ব্রিটিশ সৈন্যের যাতায়াতের অযোগ্য করে তোলে। তারপর তাদের সংগ্রাম আরও এগিয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আমাদের দেশে ব্রিটিশ সরকারের মালয়ে গুর্খা সৈন্য

পাঠানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়, কিন্তু গুর্খা সৈন্য পাঠানো বন্ধ হয় না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মালয়বাসীর একক সংগ্রাম বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রেরণা। মালয়বাসীর দাবি: সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, জাতীয় সাম্য এবং জনতার গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক। ১৯৪৯ সালে এই মধ্যবর্তী দাবির ভিত্তিতে মালয়বাসী ভবিষ্যৎ স্বাধীন মালয়ের যে ছবি এঁকে নিজেদের সামনে ধরেছে তাদের সেই স্বপ্ন জীবন্ত হয়ে উঠবেই।

❖



হো চি মিন

॥ ইন্দোচীন ॥

ভিয়েতনাম, খ্মের দেশ (কাম্বোডিয়া) ও প্যাথেট লাও এই তিনটি দেশ নিয়ে ইন্দোচীন। আনুমানিক ৩ কোটি লোকের বাস আর আয়তন ২ লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গ মাইল। ১৮৮৯ সালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীন দখল করেছিলো। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কীভাবে ইন্দোচীনের ওপর হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক অব ইন্দোচায়নার লাভের হিসেব থেকে।

২০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক পুঁজি নিয়ে এই ব্যাঙ্কটি কাজ আরম্ভ করে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের মোট পুঁজি দাঁড়ায় ১ হাজার

কোটি ফ্রাঙ্ক। এই পুজি ছাড়া কোটি কোটি ফ্রাঙ্ক লভ্যাংশ হিসেবে এই ব্যাঙ্কটি দিয়ে এসেছে এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা পুঁজি-পতিদের। ১৯৪৮ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে এই ব্যাঙ্কের কর্তারা বলেন যে, একমাত্র মদ ও আফিম বিক্রি করে ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্কটি লাভ করে ১০০ কোটি ফ্রাঙ্ক।

১৯৪০ সালে ফরাসীদেশে হিটলারের খয়ের-খাঁ ভিসি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের সম্মতিক্রমে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ঐ বৎসরই ইন্দোচীন দখল করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ লেজ গুটিয়ে পালায়, যেমন পালিয়েছিলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ মালয় ছেড়ে।

ইন্দোচীনের প্রাণের প্রিয় নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে ইন্দোচীনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠন তৈরি করে। তার নাম ভিয়েত জনগণের লীগ বা ভিয়েতমিন।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই সংগ্রাম সফল হয়। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে ভিয়েতনাম গণতন্ত্রী রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৬ সালে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হয় ও একটি লোকসভা তৈরি হয়। এই লোকসভার প্রথম সভাপতি হন হো চি মিন। ১৯৪৬ সালে তৎকালীন ফরাসী সরকার হো চি মিনের তৈরি সরকারকে স্বীকার করে। কিন্তু এর পেছনে ছিলো চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বাস-ঘাতকতা। তাই ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী সৈন্য ভিয়েতনাম আক্রমণ করে যাতে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ধ্বংস

হয় আর ইন্দোচীনকে আবার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পর্যবসিত করা যায়।

ভিয়েতনাম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ খ্মের-দেশ ও প্যাথেট লাও-এর নির্বাচিত সরকার দুটির বিরুদ্ধেও অভিযান শুরু করে।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিলো, সহজেই বশে আনবে স্বাধীনতাকামী ইন্দোচীনের জনসাধারণকে। তাদের সে আশা ভেঙে গেছে। ১৯৫৪ সালে ফরাসীদেশে "ইন্দোচীনে লড়াই বন্ধ করো" এই দাবি নিয়ে আন্দোলন হয়। এই গণদাবি অস্বীকার করতে না পেরে এবং দিয়েন বিয়েন ফুর বিরাট পরাজয়ের পর সর্বাঙ্গীন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মেঁ দেঁ্য ফ্রান্স মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

১৯৫২ সালের মার্চমাসে ফরাসী সরকার স্বীকার করে যে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ইন্দোচীনের লড়াইয়ের খাতে তারা ১৪৩০০০০০০০০ টাকা খরচ করেছে এবং ১৯৫২ সালে এই খাতে খরচের জন্যে তাদের লাগবে আরও অন্তত ৪৯৪০০০০০০০ টাকা। ১৯৫৩ সালে ৭ বছর লড়াইয়ের পর ২০০০০০ ফরাসী সৈন্য ইন্দোচীনের মাটিতে হতাহত হলো। অথচ এতো খরচ এতো পরিশ্রম করেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাতে রইলো ইন্দোচীনের ৫ ভাগ জমির মাত্র ১ ভাগ, অর্থাৎ গুটিকয়েক শহর মাত্র। বাকি সমস্ত দেশে চলতে থাকলো

স্বাধীন ভিয়েতনামের সরকার, স্বাধীন ভিয়েতনামের আইনকানুন।

১৯৫৩ সালের শেষাশেষি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে শুরু করলো যে ১৯৫৪ সালে যদি স্বাধীন ভিয়েতনাম বা ভিয়েতমিন দেশ জুড়ে ব্যাপক আক্রমণ চালায় তবে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে চিরদিনের মতো ছাড়তে হবে ইন্দোচীন। সব দস্যুর সেরা দস্যু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে যতো পারে সাহায্য দিতে শুরু করলো। ১৯৫৩ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে ইন্দোচীনে ব্যবহারের জন্যে পাঠালো ৯ কোটি রাউণ্ড গুলিগোলা, ৮০,০০০ কামানবন্দুক, ১১০০০ লরি ও অন্যান্য মোটরগাড়ি, অনেক বিমান ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কপালে জুটলো এক পরাজয়ের পর আর এক পরাজয়। ওদিকে সমস্ত মার্কিন অর্থ সাহায্য ছাড়িয়ে ব্যয়ের অঙ্ক বেড়েই চললো। ফরাসী সরকার এক আর্থিক সঙ্কট থেকে উঠতে না উঠতেই আর এক আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে লাগলো।

স্বাধীন ভিয়েতমিন সরকার কিন্তু বারে বারে শান্তির চেষ্টা করে যেতে লাগলো কারণ ভিয়েতমিন সরকার জানতো যে ইন্দো-চীনের প্রত্যেকটি মানুষ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র আশা হলো যুদ্ধ চালু রাখা। যুদ্ধ বন্ধ হলেই ইন্দোচীনের জনসাধারণ নিজেদের একতার জোরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে দূর করতে পারবে।

১৯৪৬ সালে ফরাসী আক্রমণ শুরু হবার পর ভিয়েতনাম গণতন্ত্রী রিপাবলিক বহুবার শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে।

১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে হো চি মিন ফরাসী সরকারকে শান্তির প্রস্তাব করে চিঠি লেখেন। ১৮ই ডিসেম্বর হো চি মিন আবার লেখেন। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি হো চি মিন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সেনানায়ক জেনারেল লেসার্সকে আবার লেখেন -'ন্যায্য শান্তি এখনও আসতে পারে'। ২০শে জানুয়ারি হো চি মিন আবার লেখেন ফরাসী রাষ্ট্রের সভাপতির কাছে।

১৯৪৭ সালে হো চি মিন শান্তির প্রস্তাব করেন ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২রা ও ২১শে মার্চ, ২২শে মে, ১৪ই ও ৩০শে জুন, ১৮ই জুলাই, ২৩শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর।

১৯৪৮ সালে শান্তির আবেদন আসে স্বাধীন ভিয়েতনামের কাছ থেকে কমপক্ষে চার বার: ১৫ই জানুয়ারি, ১২ই এপ্রিল, ৬ই সেপ্টেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর।

১৯৪৯ সালে হো চি মিন আবার শান্তির আবেদন জানান অন্তত দুবার। ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে শান্তির আবেদন আসে স্বাধীন ভিয়েতনামের কাছ থেকে বার বার।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপে ফরাসী সরকার এই শান্তির আবেদনগুলিকে দুর্বলতার প্রমাণ ভেবে অগ্রাহ্য করে। ১৯৫৪ সালে স্বাধীন ভিয়েতমিনের প্রধান সেনাপতি জেনারেল গিয়াপ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে শেষ শিক্ষা দেন দিয়েন বিয়েন ফুর সংগ্রামে। দিয়েন বিয়েন ফুর পরাজয় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মর্মান্তিক গ্লানিকর পরাজয়। স্বাধীনতার ইতিহাসে ভিয়েতনামের জনসাধারণের ফৌজের এই ঐতিহাসিক জয় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এই পরাজয় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে শিক্ষা দিলো, ভিয়েতমিনের

শান্তির আগ্রহ স্বাধীন ভিয়েতনামের দুর্বলতার পরিচয় নয়। জেনেভা সম্মেলনের সাফল্যের গোড়াপত্তন করলো দিয়েন বিয়েন ফুর ফরাসী পরাজয়।

ইতিমধ্যেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা কী হয়েছিলো তার প্রমাণ পাবে এই থেকে যে, দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধের আগেই ভিয়েতনামের শতকরা ৯০ ভাগ অঞ্চল ছিলো স্বাধীন ভিয়েতনামের অন্তর্গত। প্যাথেটলাও-এর মুক্ত অঞ্চল ছিলো সারা দেশের এক-তৃতীয়াংশের বেশি। ক্মেরদেশে মোট ৮৯টির মধ্যে ৬৪টি এলাকাই ছিলো মুক্ত অঞ্চল।

দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধের সময়-সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উঠে পড়ে লাগে ইন্দোচীনের যুদ্ধকে এশিয়াজোড়া যুদ্ধে পরিবর্তিত করতে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে যাতে চীন দেশের ওপর আক্রমণ হয় তার চেষ্টা করে। কিন্তু ফরাসী দেশের জনমত, ইংল্যাণ্ডের জনমত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলে এই চক্রান্ত বিফল হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হয় ও জেনেভা সম্মেলন শুরু হয় ইন্দোচীনের সমস্যা আলোচনার জন্যে।

১৯৫৪ সালের ২০শে জুলাই গভীর রাত্রে জেনেভায় ইন্দোচীন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়. এই চুক্তির প্রধান শর্তগুলি এইরূপ :—

১। ভিয়েতনাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক চুক্তিতে যোগ দেবে না। ভিয়েতনাম দেশের কোনো অংশে কোনো বিদেশী সামরিক ঘাঁটি বসতে দেবে না।

অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বুঝবে। উত্তর কোরিয়া আক্রমণের তিনমাস আগে যখন আক্রমণের জন্যে তোড়জোড় চলেছে পুরো দমে দক্ষিণ কোরিয়ায়, তখন এই আক্রমণের তোড়জোড় সম্বন্ধে একেবারে চুপচাপ না থাকার অপরাধে দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভার ১৩ জন সদস্যের দেড় বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। এই ১৩ জন সদস্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধ আরোপ করা হয় তার মধ্যে একটি ছিলো "দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বারা উত্তর কোরিয়া আক্রমণে বাধা দান"।

কিন্তু কেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করলো? এর জবাব পেতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে গুটিকয়েক কথা।

চীনদেশ থেকে মার্কিন কুকুর চিয়াং কাই-শেক পলায়ন করলো। ১৯৪৯ সালে সমস্ত চীনদেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হলো চীনদেশের গণতান্ত্রিক সরকার। সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুণলো। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে গেলো ৬০ কোটি লোকের একটি বিরাট বাজার যেখান থেকে সে লুট করতো কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর।

মার্কিন নৌবাহিনী চিয়াং কাই-শেককে ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে আশ্রয় দিয়ে পাহারা দিতে লাগলো। চীনদেশের গণতান্ত্রিক সরকার ফরমোজা দ্বীপ চীনদেশেরই চিরাচরিত অংশ হিসেবে গণ্য হবে এই কথা পৃথিবীর প্রত্যেকটি সরকারকে জানালেন এবং চিয়াং কাই-শেককে এইভাবে মার্কিন আওতায়

রাখার প্রতিবাদ করলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভাবলো, ভালোই হলো : ফরমোজা দ্বীপ নিয়েই চীনদেশের সঙ্গে লড়াই শুরু করা যাবে। তাই তারা মার্কিনদেশ থেকে তাড়াতাড়ি বহু অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে লাগলো ফরমোজায়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে খবর পাওয়া গেলো যে, মার্কিনদেশ থেকে ফরমোজায় কমপক্ষে ৪৫ কোটি টাকার যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে।

কিন্তু চীনদেশের সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই মতলব বুঝে ফরমোজা দ্বীপ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যাতে কিছুতেই যুদ্ধের আগুন না লাগাতে পারে তার বন্দোবস্ত করলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বোকা বনে অন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে তাদের চোখ পড়লো ছোট্ট দেশ কোরিয়ার ওপর।

কোরিয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্তত আট বার চীনদেশ ও রাশিয়া আক্রমণ করেছিলো। এই পথেই সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনদেশকে আক্রমণ করে ১৯০৫ সালে কোরিয়া দখল করার পর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক করলো, ঐ পথেই তারাও চালাবে চীনদেশের ওপর আক্রমণ। কিন্তু কবে? দেরি তো আর সয় না! কারণ যতোই দিন যায় ততোই শক্তিশালী হয়ে ওঠে চীন। নতুন চীন সরকারকে ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের সরকার ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে। প্রত্যেকদিন চীনদেশে চলেছে বিরাট পরিবর্তনের সমারোহ। কাজেই দেরি করার বিড়ম্বনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বুঝতে বাকি রইলো না।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের পর কোরিয়াবাসী নিজেদের

২। যুদ্ধবিরতি সীমারেখা টানা হবে মোটামুটি ১৭ ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর।

৩। ১৯৫৬ সালের ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে সারা ভিয়েতনাম পার্লামেন্টের জন্যে দেশব্যাপী নির্বাচন হবে।

৪। যুদ্ধবিরতি পরিদর্শন করবে ভারতবর্ষ, পোল্যাণ্ড ও কানাডাকে নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক কমিশন। ভারতবর্ষ এই কমিশনের সভাপতি।

৫। চার প্রধান শক্তি—সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স চীন এই শান্তিচুক্তির গ্যারান্টি (প্রতিশ্রুতি) দাঁড়াবে। মার্কিন রাজ্য একটি বিবৃতিতে প্রতিশ্রুতি দেবে যে সে বলপূর্বক এই শান্তি ভঙ্গ করবে না কিংবা এই চুক্তি ধ্বংস করবার জন্যে বলপ্রয়োগের হুমকিও দেবে না।

৬। হানোই ও হাইফাং সমেত লাল নদীর সমস্ত বদ্বীপ থেকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য অপসারিত হবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ৮।৯ মাসের মধ্যে।

এই জেনেভা চুক্তি বিশ্বের শান্তিকামী জনসাধারণের এক বিরাট জয়। ইন্দোচীনের সংগ্রামী ও স্বাধীনতাকামী মানুষের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিশেষ জয়। ৮ বৎসর পরে ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপিত হলো এই চুক্তির ফলে।

গভর্ণর ল্যাম্বের নাম তোমরা বোধ করি শোনো নি। ইংরেজিতে, (শুধু ইংরেজিতেই বা কেন), ল্যাম্ব কথাটি বললে যে-জন্তুটির ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি প্রাণিজগতের একটি সব থেকে শান্ত নিরীহ জন্তু। কিন্তু যে ল্যাম্বের কথা বলতে বসেছি সে কিন্তু সাংঘাতিক ভয়াবহ একটা হিংস্র জন্তু। সাম্রাজ্যবাদীরা যাই বলুক, তোমার আমার মতো লোকের পক্ষে টানগানেইকার লাটসাহেব ল্যাম্বকে হিংস্র জন্তু ছাড়া আর কিছু বলা সম্ভব নয়। খুলেই বলি কথাটা।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের বা ইউনাইটেড নেশনস্-এর ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিল আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। এঁরা টানগানেইকার গভর্ণর ল্যাম্বকে এঁদের সামনে সাক্ষী দিতে ডাকেন। সাক্ষীপ্রসঙ্গে গভর্ণর ল্যাম্ব মন্তব্য করেন, টানগানেইকার লোককে চাবুক মেরে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করা যাবে না, কেননা কালো আফ্রিকাবাসীকে জেলে দিয়ে কোনো ফল হয় না। কারণ, জেলে যা থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা, অধিকাংশ কালো আফ্রিকাবাসীর কপালে তাও জোটে না। কাজেই জেলে পাঠালে শাস্তির চেয়ে তাদের আরামই হয় বেশি। গভর্ণর ল্যাম্ব এই কথা বলে লজ্জায় মাথা নোয়ায় নি—তার টকটকে লাল মুখ রক্তের নেশায় যেন আরও লাল হয়ে উঠেছিলো।

গভর্ণর ল্যাম্বের মতো মানুষের মূর্তিতে বিভীষিকাই আফ্রিকাবাসীর প্রতি সাম্রাজ্যবাদের অবদান।

হাজার হাজার সাম্রাজ্যবাদী জন্তুরা আফ্রিকার বুকে শতাব্দী ধরে যে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তা সমস্ত মানুষের ইতিহাসে এক অত্যন্ত মর্মান্তিক লজ্জার ইতিহাস।

মানুষের ইতিহাসের যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা বলেন যে ইউরোপের লোকজন যখন বর্বর অবস্থায় বনবাদাড়ে পাহাড়পর্বতে ঘুরে বেড়াতো তখন এই আফ্রিকা মহাদেশেই উদ্ভব হয়েছিলো এক আশ্চর্য উন্নত সভ্যতার। কিন্তু সাময়িকভাবে পিছিয়ে পড়ার অপরাধে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের হাতে এই প্রাচীন মহাদেশের জনসাধারণের নিগ্রহের আজ আর সীমা নেই।

আজ এই কালো মানুষদের দুঃখ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বহু শতাব্দীর জমানো কান্না আজ তাদের চোখের আগুনে আর হাতের শক্ত মুঠোয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের এই কালো মানুষদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানুষের এক জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের মতো।

শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ যখন ইউরোপে সবে গড়ে উঠছে, তখন থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বছরের পর বছর সাম্রাজ্যবাদ হাজার হাজার নিরীহ আফ্রিকাবাসীকে জোর করে ধরে এনে দেশ দেশান্তরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দিয়েছে। সবশুদ্ধ হিসেব নিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় অন্তত ১০ কোটি। কিন্তু এই সব নয়। সাম্রাজ্যবাদের এমনি রীতি যে, যে-আফ্রিকাবাসী মাত্র দুশো বছর আগেও খেতে পেতো, ছিলো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—আজ সেই আফ্রিকাবাসী ক্ষুধায় কাতর, রোগে জর্জর। তারই দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা লুঠ করে

নিয়ে গেছে, তারই দেশের লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্য-বাদীরা খুলেছে খেতখামার, আর সে হয়েছে নির্বাসিত—তাকে ফিরতে হয়েছে কুকুরের মতো কাজের জন্যে, একমুঠো অন্নের জন্যে।

আফ্রিকা মহাদেশে গোল্ডকোষ্ট এলাকা অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই এলাকা পরিদর্শনে যান ১৯৫১ সালে একদল ইংরেজ চিকিৎসা-বিশারদ ও সামাজিক কর্মীরা। তাঁরা ফিরে এসে যা বললেন তা থেকে এ-দেশের অবস্থার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন যে, গোল্ডকোষ্টে গ্রামপিছু ৬ জনের বেশি ছেলে কোনো স্কুলে যাওয়ার বা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন যে, যে-গ্রামটিকে তাঁরা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিলেন সেখানে ১৬২টি শিশুজন্মের মধ্যে এক বছরের বেশি বেঁচে ছিলো মাত্র ৮৭টি। এবং গ্রামটির শতকরা ৫০টি বাচ্ছা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবজনিত নানা রোগে জর্জরিত ছিলো। গ্রামে কোনো পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিলো না এবং যে-জল পানীয়-জল হিসেবে ব্যবহৃত হতো তা অত্যন্ত নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থা গ্রামে ছিলো না এবং এমন বাড়ি ছিলো না যেখানে ম্যালেরিয়ার রোগী নেই।

গ্রামটির অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন যে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই কোকোর চাষ করতো। এই প্রসঙ্গে তাঁরা গোল্ডকোষ্ট ও নাইজেরিয়ার কোকো বোর্ডের নাম স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁরা বলেন যে, এই কোকো বোর্ড

গোল্ডকোষ্ট বা নাইজেরিয়ার সমস্ত উৎপন্ন কোকোর একমাত্র মালিক। এই কোকো কেনা বা বেচার ব্যাপারে অন্য কারুর কোনো হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। অর্থাৎ কোকো বোর্ডের হাতে একচেটিয়া মালিকানা। এই একচেটিয়া মালিকানার জোরে ও আফ্রিকাবাসীকে শোষণ করে কী বিরাট লাভ এই সাম্রাজ্যবাদীদের সংগঠনটি করছে তার নমুনাও তাঁরা দেন। তাঁরা দেখান যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে সমগ্র কোকো ফসল বাবদ এই বোর্ডটি ঐ দেশগুলির কোকো-চাষীদের মোট যা টাকা দিয়েছিলো তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ কোটি টাকা। এবং ঐ বছরেই ঐ কোকো বিক্রি করে এই বোর্ড পেয়েছিলো ৭২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এক বছরে মোট লাভ দাঁড়ালো ৪৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ সালে এই বোর্ডের মোট লাভের পরিমাণ : ৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

৪ বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাম্রাজ্যবাদের লাভ আর জন্মের পর এক বৎসর পূর্ণ হবার আগেই শতকরা ৫০টি কালো আফ্রিকাবাসী শিশুর মৃত্যু—এই হলো দুটি পাশাপাশি ছবি।

কিছুদিন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন কাগজে কেনিয়ার মাউমাউ সন্ত্রাসবাদের কথা প্রায়ই বেরোচ্ছে। এই জঘন্য মিথ্যা সাম্রাজ্য-বাদ রটনা করার চেষ্টা করছে যে, কেনিয়ার স্বাধীনতাকামী জনতা আসলে একদল রক্তপিপাসু হত্যাকারী ছাড়া কিছুই নয়। সেদিন সমস্ত লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি জোমো কেনিয়াটা ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে দীর্ঘ

কারাবাসে দণ্ডিত করলেন সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে।

এই কেনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব কী বীভৎস তা দেখলেই বুঝবে যে, কেনিয়ার মানুষ যদি আজ বিদ্রোহের পথ ধরে থাকে তার একমাত্র কারণ এই যে মানুষের মতো বাঁচতে হলে তার আর অন্য পথ নেই।

কেনিয়া আকারে ২৪৫০০০ বর্গ মাইল। ১৯৩৯ সালে এখানকার লোকসংখ্যা ছিলো—১৯০০০ শ্বেতাঙ্গ, তার মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ ; ৪৫০০০ ভারতীয় ও গোয়াবাসী ; ১৩০০০ আরব এবং ৩০ লক্ষের বেশি আফ্রিকাবাসী।

কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গরা থাকে বিলাস ও ভোগের আড়ম্বরে। আইন করে তারা ঠিক করেছে যে, সমস্ত দেশে যা সবথেকে ভালো জমি তা শ্বেতাঙ্গ ছাড়া আর কেউ ভোগ করতে পারবে না। বড়ো বড়ো খেতখামার এই শ্বেতাঙ্গদের হাতে। তাতে দিনরাত অবিরাম পরিশ্রম করে আফ্রিকাবাসী ভূমিহীন খেত-মজুর। কারখানায় বা জমিতে এই মজুরেরা মজুরি পায় কতো? ৩০ দিনের কাজের বদলে এরা মজুরি পায় মাসে ৫ টাকা থেকে ৯ টাকা। কাজে বিন্দুমাত্র গাফিলতি হলে কপালে আছে জেল কিংবা অর্থদণ্ড। যদি কোনো লোক পলাতক কোনো দিনমজুরকে আশ্রয় দেয় তবে আইনের চোখে এই আশ্রয়দাতাও হয় অপরাধী।

পলাতক মজুরকে আশ্রয় দেবার অপরাধে ৬ মাস কারাদণ্ডের অথবা ২০০০ টাকা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা পিনাল কোডে আছে।

১৯১৫ সালে কেনিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এক আইন

পাশ করে যে, কেনিয়ার সমস্ত জমি ঐ বছর থেকে ইংরাজ সরকারের হয়ে গেলো। অর্থাৎ যে স্বাধীন চাষী এতোদিন নিজের জমি চাষ করে খাচ্ছিলো রাতারাতি এক কলমের খোঁচায় সে হয়ে গেলো সরকারের চাকর। এই রকম আবার আর এক আইন জারি হলো কিছু দিন পরে। আইন হলো, ১৬ বছর বা তার থেকে বেশি বয়সের প্রত্যেকটি আফ্রিকাবাসীকে বছরে অন্তত ৯ টাকা মাথাপিছু ট্যাক্স দিতে হবে, তা সে বেকারই হোক আর নিঃস্বই হোক আর ভিখারিই হোক।

কোটি কোটি টাকা সাম্রাজ্যবাদের পকেটে গেলো। তার বদলে কেনিয়াবাসী পেলো কী? হিসেব করে দেখা গেলো, কেনিয়ার সরকার আফ্রিকাবাসী শিশুদের জন্যে বছরে শিক্ষার খাতে খরচ করতে রাজি আছে মাথাপিছু ৬ টাকা আর তারই পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গদের শিশুদের জন্যে শিক্ষার খাতে বছরে মাথাপিছু খরচ হচ্ছে ৩২৫ টাকা।

শ্বেতাঙ্গ শাসকরা মানুষের সমস্ত অধিকার থেকে কেনিয়ার অধিবাসীদের বঞ্চিত রেখেছে। ৫ জনের বেশি কেনিয়াবাসীর একত্রে মেলামেশা করতে হলে সরকারের অনুমতি লাগে। ভোট দেওয়া অথবা দেশশাসনে কেনিয়াবাসীর বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। শাসনের ভার আছে শ্বেতাঙ্গ রাজ্যপাল ও এই রাজ্যপালের আটজনের একটি পরামর্শদাতা মন্ত্রিসভার ওপর—যেমন রাজ্যপাল, তেমনি এই মন্ত্রিসভার সকলেই শ্বেতাঙ্গ।

এই সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেনিয়াবাসী দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে কেনিয়ার

ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট হয় পূর্ব আফ্রিকা সংসদের সভাপতিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডব সমগ্র কেনিয়াদেশ জুড়ে। আজও তেমনি তাণ্ডব চলেছে।

কেনিয়াবাসীরা বহুদিন ধৈর্য ধরে দরখাস্ত করে, আবেদন করে তাদের অবস্থার উন্নতি দাবি করেছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কাজ থেকে পেয়েছে শুধু ছলনা ও পীড়ন। যতোই দিন গেছে ততোই তাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ গেছে বেড়ে। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাড়া খেতে খেতে পলাতক সাম্রাজ্য-বাদ শেষ ঘাঁটি করতে চেষ্টা করছে আফ্রিকায়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চারিপাশে আজ আগুন জ্বলছে—পূর্ব আফ্রিকায় বা কেনিয়ায় শুধু নয়, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে। গ্রামশহর পুড়িয়ে, বিমান থেকে আগুন বৃষ্টি করে, বোমা মেরে, হাজার হাজার দেশপ্রেমিককে জেলে পুরে, গুলি মেরে তারা এই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে পারবে না।

বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আজ যে বিরাট গণ-আন্দোলন তা সত্যিই একমহাদেশব্যাপী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মালানের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে এক বিরাট একতার আন্দোলন। এর মধ্যে আছে আফ্রিকাবাসী, এর মধ্যে আছে ভারতীয়রা, এর মধ্যে আছে সকল দেশের সকল জাতির লোক। ঠিক এমনি এক আন্দোলন চলেছে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে বামানগয়াটো জাতির মধ্যে সেরেটসের দ্বীপান্তর দণ্ডের প্রতিবাদে।

মহাদেশের উত্তর প্রান্তে যেখানে আরব জাতির বাস, সেইখানে টিউনিসিয়ায় ও মরোক্কোয় চলেছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতার লড়াই। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আজ পেছপাও হতে বাধ্য হচ্ছে।

পশ্চিমে আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিষুবরেখার পাশে ফরাসী সাম্রাজ্যে আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিয়েছে। গোল্ডকোষ্টে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণ এগিয়ে চলেছে এবং যে দল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কথা বলছে তাদের বিপুল ভোটে জয় হচ্ছে—যেমন, কনভেনশন পিপ্‌ল্‌স পার্টির।

নাইজেরিয়ায় এক ব্যাপক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব নাইজেরিয়া সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সম্মিলিত সমাবেশ হিসাবে বেড়ে উঠছে।

সুদানে জোরালো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তো গড়ে উঠছেই এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ যে নতুন সংবিধান জনসাধারণের ওপর ভুয়ো স্বাধীনতার খোলোস হিসাবে চাপাতে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে এখনই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে গণ-আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছে।

উগাণ্ডায় বাটাকা আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছে। রোডেসিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদ-পরিকল্পিত মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। আফ্রিকার প্রায় সব জায়গাতেই শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং বহু অত্যাচার করেও এই আন্দোলনকে ধ্বংস করা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এক ঝলকে দক্ষিণ আফ্রিকা

* দক্ষিণ আফ্রিকায় মালান সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির বলিদান ৯০ লক্ষ আফ্রিকাবাসী, ৩৫০০০০ ভারতীয়।

প্রায় ১০লক্ষ মিশ্রিত বর্ণের আফ্রিকাবাসীরা এ পর্যন্ত যে সুবিধাগুলি পেয়েছিলো তাও তারা হারাতে বসেছে।

* শাসক শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম

* যদি তুমি অশ্বেতাঙ্গ হও

তোমার ঘোরাফেরার স্বাধীনতা নেই। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুমি থাকতে পারবে না। ইচ্ছা করলে বাড়ি বদলাতে পারবে না। যা কাজ করতে ভালো লাগে তাই করবে আর না পোষালে কাজ ছেড়ে দেবে—এ অধিকার তোমার নেই। সব সময় তোমায় 'অনুমতিপত্র' নিয়ে ঘুরতে হবে। এমন এমন ব্যবস্থা আছে যা মানতে গেলে তোমায় কমপক্ষে ১২টি বিভিন্ন 'অনুমতিপত্র' সর্বদা সঙ্গে রাখতে হবে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোনো তোমার বারণ। ট্রাম, বাস বা ট্রেনে একমাত্র অশ্বেতাঙ্গদের জন্যে যে-গাড়ি তাতেই তুমি চড়তে পাবে।

* অশ্বেতাঙ্গদের ভোট দিয়ে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার নেই। ট্রেড ইউনিয়ন গড়া আইনবিরুদ্ধ।

* আন্দোলন

১৯৫২ সালে এক ব্যাপক অহিংস আন্দোলন শুরু হয় এই

স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে সামিল হয়: আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেস, কালার্ড পিপ্‌লস অ্যাকশন কমিটি ও সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস।

* দমননীতি

মালান সরকার কমিউনিষ্ট দলন আইন পাশ করে এই উদ্দেশ্যে যে, এই আইনের সাহায্যে সমস্ত বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করা যাবে। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে সব রকম সভাসমিতি বন্ধ করে আইন জারি হয়। ১৯৫৩ সালে ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ড-মেন্ট বিল পাশ হয়। এর পর পাবলিক সেফটি বিল পাশ হয়। এই আইন দুটির অর্থ এই যে, সরকার যে-কোনো লোককে যে-কোনো দিন সরকার-বিরোধী বলে গ্রেপ্তার করতে পারে এবং এই অপরাধের দণ্ড হিসাবে ৪০০০ টাকা অর্থদণ্ড, দশ ঘা বেত ও তিন বছর কারাদণ্ড হতে পারে। এ ছাড়া সরকার যদি তোমায় 'উস্কানি' দিয়েছো এই অপরাধে ধরে তবে দণ্ড আরও বেশি: ৬৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ১৫ ঘা বেত কিংবা ৫ বৎসর কারাদণ্ড। ১৯৫৩ সালের গোড়া পর্যন্ত ৯০০০ সত্যাগ্রহী জেলে ছিলেন। আজ জেলে বন্দীদের সংখ্যা বেশি বই কম নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সভ্য—ভারত সরকারও তাই।

॥ মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ॥

তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে অনেক ছোটো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ যেমন দেশকে বারেবারে খণ্ডিত করেছে, যেমন বিভিন্ন প্রদেশের সীমারেখা টেনেছে নিজেদের ইচ্ছামতো, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির সীমারেখা নির্ধারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যথেচ্ছাচার চালিয়েছে প্রচুর। একই জাতিকে জোর করে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিতে দ্বিধা বোধ করে নি।

এই রকমভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারণের একটিই উদ্দেশ্য ছিলো এবং সেই উদ্দেশ্যটি হলো এমনভাবে রাষ্ট্রগুলিকে ভাগ করা যাতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ লেগেই থাকে, যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত জাতীয় সমাবেশ গড়ে উঠতে না পারে। সাম্রাজ্যবাদের এই ইচ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয় নি। আজ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার ডেকেছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সব কারসাজি সেখানে ব্যর্থ হতে চলেছে।

বিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ খুঁটি গেড়েছে প্রধানত প্রথম মহাযুদ্ধের পর, যখন পুরনো তুরস্ক সাম্রাজ্যকে চিরদিনের মতো নিঃশেষ করে ফেলা হলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যপ্রাচ্যে প্রধানত ফরাসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজত্ব করতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকোপ বেড়েছে। আজ এই অঞ্চলকে কে বেশি লুটবে, এই নিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লড়াই মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ প্রিয় লুটের জিনিস হলো এখানকার তেল। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী তেল কোম্পানি (নাম তার অ্যাঙলো-ইরানিয়ান) মধ্যপ্রাচ্য থেকে বছরে ২৪৮০০০ টন তেল উৎপাদন করতো। ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানিটিই যা তেল উৎপাদন করতে থাকে তার পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ১০৩২৯০০০ টন অর্থাৎ ১৯১৩ সালের তুলনায় ৪০ গুণ বেশি। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে তেলের উৎপাদন যায় আরও বেড়ে এবং বছরে ৩২২৫৯০০০ টন তেল তোলা হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ কোম্পানিটির মোট লাভ হয় ৮১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আর ঠিক তার পরের বছর ১৯৫০ সালে এদের লাভ দাঁড়ায় ১৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ।

ইরানের সরকারকে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এই তেল তোলা বাবদ কতো টাকা দিয়েছিলো? ১৯৫০ সালে ইরান সরকারকে এরা দিয়েছিলো মাত্র ২০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আর এই টাকা, এরা মোট লাভের যা হিসেব দিয়েছে তার থেকে, আলাদাই রেখেছিলো। এ ছাড়া আরও ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্রিটিশ কোম্পানিটি আলাদা করে রাখে। তাহলে মোট লাভের সংখ্যাটা কী দাঁড়ালো দেখো: ১৯১ কোটি ৬০ লক্ষ। আর এর বদলে ইরান সরকার পেলো ২০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

মধ্য প্রাচ্যে তেলের ভাণ্ডার অফুরন্ত, কিন্তু এই তেল বেচে সেখানকার জনসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাই লুটে নিয়ে যায় সমস্ত লাভ। ১৯৪৯-৫০ সালে এই অঞ্চলে যে বিদেশী পুঁজি খাটছিলো তার

পরিমাণ যে কী বিপুল তা দেখলেই ব্যাপারটা বুঝবে। অর্থনীতিবিদদের মতে ১৯৪৯-৫০ সালে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিলো ৫০০ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে অধিকাংশই ছিলো ব্রিটিশ ও মার্কিন পুঁজি।

এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের দুঃখকষ্টের সীমা নেই। এ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যাতে কায়েম থাকে এই জন্যে এই অঞ্চলে জনসাধারণকে কোনো রকম স্বাধীনতা দিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অথবা তাদের অনুচররা একেবারেই নারাজ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার বালাই মধ্য-প্রাচ্যে নেই। ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা সমিতি, ছাত্র সংগঠন এই রকম কোনো কিছু করা সেখানে বিরাট অপরাধ। কী বর্বর শাসন এই অঞ্চলে চলে তার উদাহরণ হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী তেল কোম্পানি আরেবিয়ান আমেরিকান অয়েল কোম্পানির জমিদারি সৌদি আরবের কথা ধরো। এইখানে যে কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় তার হাতদুটি কেটে ফেলে। আমেরিকান তেল কোম্পানিটির এলেকার মধ্যেও এই শাস্তিপ্রথা ১৯৪৮ সালেও পুরোদমে চালু থাকে। কিন্তু এই ঘটনা থেকে তুমি যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার কথা ভাবো তা হলে ভুল হবে। কারণ যে-সে ছুরি দিয়ে এই হাত কাটা অন্তত তেল কোম্পানিটির এলাকায় হতো না। এখানে যে-ছুরি দিয়ে হাত কাটা হতো তা অতি-আধুনিক মার্কিন হাসপাতালে বীজাণু-ধ্বংসী কলের মধ্যে বীজাণুমুক্ত অবস্থায় থাকতো। হাত কাটা হয়ে গেলে মার্কিন চিকিৎসক ক্ষত

সেলাই করে দিতো। এই হলো মধ্যযুগীয় ও মার্কিন বর্বরতার মিতালির চিত্র।

১৯৫১ সালে ইরান সরকার অ্যাঙলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির যথেচ্ছ লুটে বাধা দিতে চাইলো। তারা বললো, বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা ব্রিটিশ কোম্পানিটি ইরান থেকে নিয়ে চলেছে। এখন এই লাভের কিছু অংশ ইরানের জন্যে রাখতে হবে। এই জন্যে ব্রিটিশ কোম্পানিটিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তেল-শিল্পটিকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পে পরিণত করার প্রস্তাব ইরান সরকার করলো। মৌচাকে ঢিল পড়লো। রেগে আগুন হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ইরানে পাঠালো নিজে-দের বড়ো বড়ো যুদ্ধজাহাজ, যাতে ধমকে, হুমকি দিয়ে ইরান সরকারকে বাধ্য করা যায়। (ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টির কথা তোমরা শুনেছো। এই লেবার পার্টির নেতারা যে সমাজতন্ত্র-বাদের কথা আওড়ায় এও হয়তো জানো। এই লেবার পার্টির নেতারা যে কতো বড়ো ভণ্ড তা বুঝবে যদি মনে থাকে যে এই সময় ইংল্যাণ্ডের সরকারী গদিতে বসে ছিলো এই লেবার পার্টির নেতারা)।

কারসাজি ব্যর্থ হলো। ইরান সরকার ভয় পেলো না। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ কোম্পানিটিকে ইরানের আবাদান তৈলখনি ছাড়তে হলো।

ইরানের ইতিহাসে এই ঘটনা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একটি বড়ো উদাহরণ। এই সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী লড়াইয়ের আর একটা বড়ো প্রমাণ হলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে

সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার একটিমাত্র উপায় আজ সামাজ্যবাদীদের হাতে, আর তা হলো জনতার ওপর পাশবিক অত্যাচার। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে তাই সামরিক আইন চালু থাকে বছরের পর বছর। ইরাকে ১৯৪৮ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের ধরে ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা ফাঁসি দেয়। ১৯৫১ সালে ইরাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা ছিলো কমপক্ষে ১৫০০০। জর্ডান দেশে ১৯৫২ সালে কমিউনিষ্ট বলে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যাদের নেতা বলে সাব্যস্ত করা হয় তাদের ১০ বছর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে মরুভূমির মধ্যেকার জেলগুলিতে নির্বাসিত করা হয়।

॥ মিশরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ॥

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত মিশরের জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। বস্তুত মিশরও পুরনো তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ ছিলো। ৩৮৩২০০ বর্গমাইল ও ২০ কোটি লোকের এই দেশ, যা পৃথিবীর এক অতি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিলো, সেই দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চলেছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে। এই শোষণের ফলে সেখানে জনসাধারণের দুঃখের অবধি নেই। মিশর দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মাথাপিছু গড়পড়তা মাসিক আয় ৫৩৲ টাকা। আমাদের দেশে যেমন বস্তি, রোগ, শোক—মিশরের সাধারণ লোকের জীবনেও ঠিক তাই। নীল নদের চারপাশে চাষের উর্বর জমি, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ চাষীই 'বিল হারজিয়া' নামক এক মারাত্মক ব্যাধিতে পীড়িত।

'বিল হারজিয়া' এবং দারিদ্র্যজনিত অন্য বহু ব্যাধির প্রকোপ কী ভয়ঙ্কর তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি উদাহরণে। মিশরে যতো লোক সৈন্যদলে ভর্তি হতে যায় তার মধ্যে স্বাস্থ্যের অবস্থা অধিকাংশেরই এমনি যে তাদের সৈন্যদলে ভর্তি করা হয় না। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা এই ঘটনার উল্লেখ করে দেখায় যে, ১৯৫০ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১৭ জন লোক সৈন্যদলে ভর্তি হবার দরখাস্ত করে এবং তার মধ্যে ১৬ জনকেই স্বাস্থ্যের কারণে ভর্তি করা হয় না।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশর দখল করে এবং তখন থেকেই মিশরবাসী শুরু করে তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। এই আন্দোলনের চাপে ১৯২২ সালে মিশরকে 'স্বাধীনতা' দেয় ব্রিটিশ সরকার, যদিও ব্রিটিশের হুকুমে সারা মিশরে সামরিক আইন চালু থাকে তখনও। ১৯৩৬ সালে অ্যাঙলো-মিশর সন্ধি অনুসারে রাজধানী কায়রো থেকে ও আলেকজাণ্ড্রিয়া থেকে ব্রিটিশ ফৌজ সরে এসে সুয়েজখাল এলাকায় ঘাঁটি গাড়ে। মিশরের এক অংশ সুদানের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজত্ব চলতে থাকে। এই চুক্তি অনুসারে মিশর "স্বাধীন" হলো বটে, কিন্তু মিশরের দেশরক্ষার ব্যবস্থা, মিশরের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, মিশরে বিদেশী স্বার্থ রক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকার থাকে ব্রিটিশ সরকারের। এরপর ব্রিটিশ ফৌজ সরানোর জন্যে মিশরের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চলতে থাকে অনেকদিন। ১৯৫১ সালে এই কথাবার্তা ভেঙে যায় এবং মিশরের ওয়াফ্‌দ্‌ দল ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তিকে সাম্রাজ্য-

বাদী ঔদ্ধত্য বলে ব্যাখ্যা করে। জবাবে ব্রিটিশ সরকার সুয়েজ-খাল অঞ্চলে আরও সৈন্য মোতায়েন করে এবং মিশরদেশের জনসাধারণের মিছিল, সভা ইত্যাদি ধ্বংস করার জন্যে যথেচ্ছ আক্রমণ চালায়। বহু লোক ব্রিটিশ গুলিতে প্রাণ হারায়, বহু লোক হয় জখম। মিশরের সরকার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে এবং ইউনাইটেড নেশনসের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিশর আক্রমণের দায়িত্ব আরোপ করে নালিশ করে। সঙ্গে সঙ্গে মিশর সরকার জানায় যে ব্রিটিশ ফৌজ সরিয়ে নেওয়ার পর সুদানে জনসাধারণের মত গ্রহণ করা হোক এই মর্মে যে, তারা ব্রিটিশ শাসনে থাকতে চায়, না মিশরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়।

এদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে অন্য কোনো রকমে ব্যর্থ করতে না পেরে ১৯৫২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুরু করে নগ্ন অত্যাচার। এই বছর জানুয়ারি মাসে ইসমাইলিয়ায় মিশরের ফৌজি প্রধান দপ্তর ব্রিটিশ ফৌজ আক্রমণ করে। লড়াইয়ে ৪১ জন মিশরবাসী মারা যায়। কায়রোতে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোক সভা-শোভাযাত্রা করে। উত্তরে কায়রো শহরে 'সামরিক আইন' চালু করা হয়। ওয়াফ্‌দ্‌ সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। যথেচ্ছ গ্রেপ্তার চলতে থাকে। ১৯৫২ সালের প্রথম ছ মাস 'সামরিক আইন' চাপানো থাকে মিশরের ওপর।

এই অবস্থায় জেনারেল নেজিব মিশরে সামরিক এক-নায়কত্ব স্থাপন করে। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মিশর

দেশের জনসাধারণের সংগ্রাম এগিয়ে চলে এবং ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ সরকার সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ ফৌজ সরিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়।

॥ লাটিন আমেরিকায় ও ফিলিপাইনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাড়বৃদ্ধির অন্যতম একটি বড়ো কারণ এই যে মার্কিন সাম্রাজ্যের বাড়ির পাশেই রয়েছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিপুল ধনসম্পদ ও বিরাট লোকশক্তি। এই ধনসম্পদ লুট করে এবং লোকশক্তিকে কম মজুরিতে খাটিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের লাভ ফুলে ফেঁপে আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে আর এই দেশগুলি হয়েছে বিধ্বস্ত আর এখানকার জনসাধারণের কপালে জুটেছে অপরিসীম দুঃখ ও গ্লানি। বস্তুত অন্ধকার মহাদেশ বলতে আমরা আফ্রিকাকে বুঝবো, না বুঝবো দক্ষিণ আমেরিকার এই বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-বিধ্বস্ত অঞ্চলকে, এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদরা মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। দুটি মহাদেশই যেন দুঃখের সমুদ্র। আজ যেমন আফ্রিকায়, তেমনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট রাজ্যে বিদ্রোহের আর স্বাধীনতার লড়াইয়ের আগুন জ্বলে উঠেছে।

গুয়াতেমালার সরকারের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের কথা এই বইয়ের ৫৪ পাতায় পড়েছো। এইবার অন্যান্য দেশগুলির একটু পরিচয় দেখো।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা দিয়েছে বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বড়াই করে। আর আমাদের দেশের

কিছু লোকও এই কথা বোকার মতো বিশ্বাস করে। সোজা একটা প্রশ্ন করলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভণ্ডামির মুখোস খুলে যায়। প্রশ্নটা এই যে, বাপুহে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জতে তোমাদের যাওয়ার দরকারটা ছিলো কি? যদি না যেতে তবে তো এতো কষ্ট করে স্বাধীনতা দেবার হাঙ্গামা তোমাদের করতে হতো না। আর এটাও ঠিক যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকজনরা তোমাদের আসতে নেমন্তন্ন করেনি। আসলে ব্যাপারটা কী?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যখন স্পেনের সাম্রাজ্য ভেঙে ভেঙে পড়ছে, দক্ষিণ আমেরিকায় ও সুদূর প্রাচ্যে তখন এই সমস্ত এলেকা জুড়ে এক বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে উঠেছিলো। কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণ স্পেন সাম্রাজ্যবাদের অবসান করে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করে, ঠিক যেমন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে ১২০ বছর আগে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলো জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে মার্কিনদেশের জনসাধারণ। পুয়েরটো রিকোর জনসাধারণও কিউবার ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণের মতো এগিয়ে যায় বিদ্রোহী সংগ্রামে। ঠিক এই অবস্থায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। স্বাধীনতাকামী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণ অসীম বীরত্বে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন বছর লড়াই চালিয়ে যায়। ১৯০২ সালে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে লড়াই শেষ হয়েছে যদিও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম খণ্ড-খণ্ডভাবে চলতে থাকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শোষণ করে চলছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসাধারণকে। আর তার বদলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণ পেয়েছে কী? অভাব, অশিক্ষা, দুঃখ। আজও ফিলিপাইনের অর্ধেক লোক নিজের নাম সই করতে পারে না। বেরিবেরি ও যক্ষ্মায় দেশ উজাড়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। মার্কিন শাসকরা পালিয়ে যায়। ফিলিপাইনের জনসাধারণ বুকের রক্ত দিয়ে তৈরি করে তাদের স্বাধীনতার ফৌজ। তার নাম "হুকবালাহাপ"। অসীম সাহসের সঙ্গে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায় এই "হুকবালাহাপ"। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের পর আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফিলিপাইন দখল করে, যেমন করেছিলো বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তারা সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বেআইনী করে দেয়। "হুকবালাহাপ"কে ধ্বংস করার জন্যে চেষ্টা চলতে থাকে। এই নীতির বিরুদ্ধে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণ সংগ্রাম করে চলেছে আজও; এবং যদি ১৯৪৬ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দেবার বদান্যতা দেখিয়ে থাকে তবে তার একমাত্র কারণ এই যে সোজাসুজি, খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না। তাই তাদের পিছু হটতে হয়, সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে "স্বাধীনতার" মুখোস পরাতে হয়।

যেমন ফিলিপাইনে তেমনি চিলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার শাসকশ্রেণী পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে চিলির জনসাধারণের ওপর গত ৫ বৎসর ধরে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সাধারণ মানুষ হার মানেনি। বিদেশী পুঁজির ঘাঁটি তামার ও কয়লার খনিতে সম্প্রতি চিলির শ্রমিকশ্রেণী অসীম সাহসের সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়েছে। খনির শ্রমিকদের এই সংগ্রামে সহযোগিতা করার জন্যে যোগ দেয় চিলির বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক, জাহাজী শ্রমিক এবং ডক শ্রমিক। এই সংগ্রাম আংশিক জয়লাভ করে এবং চিলি সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবাধ লুণ্ঠনে কিছু বাধা দিতে বাধ্য হয়।

ব্রেজিলে ধর্মঘট করা আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সেখানে কমপক্ষে ৭০০০০০ শ্রমিক ধর্মঘট সংগ্রাম করেছে। ব্রেজিলের সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী করেছে। মার্কিন পুলিসের সাহায্যে চলেছে ব্রেজিলে কমিউনিষ্ট দলন, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ২৭ খানি সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ ব্রেজিলের বিভিন্ন অঞ্চলে চালু আছে।

ব্রেজিলে শান্তি আন্দোলন বেআইনী ঘোষিত হয়, কিন্তু বিশ্ব-শান্তি সংসদের ষ্টকহোম আবেদনে সই দেয় ৫০ লক্ষ ব্রেজিলবাসী। ব্রেজিলের সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খোলাখুলি একটি সামরিক চুক্তি করার চেষ্টা করে কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনে তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তেমনি আন্দোলন হয় যখন ব্রেজিলের

জনসাধারণ জানতে পারে যে ব্রেজিলের তেলের খনিগুলো ব্রেজিল সরকার মার্কিন তেল কোম্পানিদের দিয়ে দেবে বলে তলে তলে ঠিক করেছে। এই আন্দোলনও জয়যুক্ত হয়।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে বলিভিয়ার জনসাধারণ সশস্ত্র বিপ্লব করে বলিভিয়ার মার্কিন-তাঁবেদার সরকারকে গদিচ্যুত করে। প্যাজ এসটেনসেরোর নেতৃত্বে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ক্ষমতা দখল করে। বলিভিয়ার টিন-খনি-সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ ছিলো গুটিকয়েক মার্কিন-তাঁবেদার কোম্পানির দখলে। প্যাজ এসটেনসেরোর সরকার এই খনিগুলিকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে দখল করে। খনিজ-শিল্পের মন্ত্রী জুয়ান লেসিন দেখান যে, টিন-খনির মালিকরা ৬ বৎসরে কমপক্ষে ৪০০০ খনি শ্রমিককে মেরে ফেলেছে শুধু অত্যাচার করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ওয়াশিংটনে ভয়ে কেঁপে ওঠে ও মার্কিনদেশের ব্যাঙ্কসমূহে বলিভিয়ার সরকারের যা পয়সাকড়ি ছিলো সব বাজেয়াপ্ত করে।

শুধু যে লাটিন আমেরিকার জনসাধারণই মার্কিন সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করছে তা নয়, সেখানকার কলকারখানার মালিকরা ও শাসক শ্রেণীর বেশ কিছু লোক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সহ্য করতে না পেরে সাম্রাজ্যবাদী জাল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যায় আর্জেন্টিনার সরকারকে। কিছুদিন আগে আর্জেন্টিনার সরকার সমাজতন্ত্রবাদী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করার চেষ্টায় এগিয়ে আসে— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আপত্তি ও ভ্রুকুটি সত্ত্বেও।

ইউনাইটেড নেশনস-এর বৈঠকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের

ইচ্ছামতো ভোট দেওয়ায় লাটিন আমেরিকার দেশগুলির প্রতিনিধিদের দিয়ে। কিন্তু ক্রমেই ব্যাপারটা কঠিন হয়ে উঠছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে।

আফ্রিকা-আরব-এশিয়ার প্রতিনিধিরা অনেক সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ও ইঙ্গিতের বিরোধিতা করছেন ইউনাইটেড নেশনস্-এর বৈঠকে।

॥ মার্কিনদেশের কালো মানুষদের কথা ॥

আফ্রিকা মহাদেশের কোটি কোটি কালো মানুষের দুঃখের আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা পড়লে। এইবার মার্কিন দেশের কালো মানুষ বা নিগ্রোজাতীয় মানুষের দুঃখ ও সংগ্রামের কথা শোনো।

প্রথমেই কথা ওঠে, আমেরিকাতে কালো মানুষ এলো কোথা থেকে ? 'জানবার কথা'য় পড়েছো কী করে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি আফ্রিকাবাসীকে ক্রীতদাস হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি করেছে। ক্রীতদাস কেনার ব্যাপারে আমেরিকার বড়োলোকরা ছিলো বিশেষ পারদর্শী। কতো ক্রীতদাস তারা কিনেছিলো তার আন্দাজ পাবে এই থেকে যে, আজ মার্কিনদেশের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ হলো মার্কিনদেশের নিগ্রো মানুষ। মার্কিনদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি আর তার মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ হলো নিগ্রো। এই ১ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ

নিগ্রো বাস করে মার্কিনদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে। এই অঞ্চলকে বলা হয় ব্ল্যাকবেল্ট। এই অঞ্চলে যতো মানুষ তার অধিকাংশ হলো নিগ্রো-জাতীয়। এই ব্ল্যাকবেল্টেও নিগ্রোদের জাতি হিসেবে কোনো অধিকার নেই বরং এইখানেই নিগ্রো মানুষের ওপর অত্যাচার সবথেকে বেশি।

এই অঞ্চল হলো প্রধানত কৃষিপ্রধান। কৃষির মধ্যে তুলোর চাষই সবচেয়ে বেশি। ৬০ লক্ষ নিগ্রোর অধিকাংশই এই তুলোর খেতে দিনমজুর বা ভাগচাষী হিসেবে কাজ করে।

মার্কিনদেশের প্রেসিডেন্ট উদারচেতা আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে মার্কিনদেশে ক্রীতদাস-প্রথা আইন করে তুলে দেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মার্কিনদেশের ৪০ লক্ষ ক্রীতদাস সেইদিন থেকে চিরদিনের মতো স্বাধীন হলো। তারপর প্রায় ১০০ বছর হতে চললো, কিন্তু আজও লক্ষ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাসের মতোই জীবন যাপন করছে। তার কারণ, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিগ্রো ক্রীতদাসরা সত্যই স্বাধীন হতে পারতো সে অর্থনৈতিক অবস্থা আজও মার্কিনদেশে আসেনি।

বস্তুত আজকের দিনের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেমন দেশে দেশান্তরে বিভিন্ন জাতিকে নিজের সাম্রাজ্যবাদী জালে টেনে নিয়েছে, উপনিবেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ আর মানুষকে শোষণ করে গড়ে তুলেছে লাভের পাহাড়, তেমনি মার্কিনদেশের মধ্যে নিগ্রো মানুষকে শোষণ করে সে তার মোটা লাভের অংশ বাড়িয়ে যাচ্ছে। কথাটা পরিষ্কার হবে যদি দু-একটা নমুনা দেখো।

মার্কিনদেশের শ্বেতাঙ্গ খেতমজুর বা ভাগচাষীর বছরে গড়পড়তা আয় প্রায় ৮০০০ টাকা আর তারই পাশাপাশি যে কালো খেতমজুর বা ভাগচাষী তার আয় গড়পড়তা বছরে ৩০০০ টাকা। অথচ কালো খেতমজুর বা ভাগচাষী শ্বেতাঙ্গ খেত-মজুর বা ভাগচাষীর চেয়ে কাজ ভালো বই খারাপ করে না। তাহলে দাঁড়ালো কি? দাঁড়ালো এই যে, উপনিবেশের জন-সাধারণকে শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদ যে অতিরিক্ত মুনাফা পায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তা তো পায়ই; তার ওপর খোদ মার্কিনদেশের এক বিরাট অংশকে শোষণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঠিক সেই অনুপাত লাভই আদায় করে। হয়তো বলবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলছি কেন? বলছি এই জন্যে: যে মার্কিন কোটিপতিরা দেশে-দেশান্তরে তাদের টাকা খাটাচ্ছে, সাম্রাজ্য বিস্তার করছে, সেই মার্কিন কোটিপতিরাই চালাচ্ছে তাদের জমিদারি মার্কিনদেশের এই অঞ্চলে।

এই দক্ষিণ অঞ্চলের নিগ্রো চাষী-শ্রমিকদের অবস্থা কী তা বোঝা যায় গুটিকয়েক ঘটনা থেকে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, এই অঞ্চলে যে নিগ্রোরা বাস করে তাদের শতকরা ৭০ জনের বাসস্থানে কোনো পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিলো না। শতকরা ৭০ জনের বাসস্থানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিলো না। শতকরা ২৭ জনের বাসস্থানে পরিষ্কার বা অপরিষ্কার কোনো জলেরই কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না।

শিক্ষার ব্যাপারে এই নিগ্রো মানুষদের কী সুযোগ দেখো! মিসিসিপি রাজ্য সরকার শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের জন্যে শিক্ষার খাতে

মাথাপিছু খরচ করে বছরে প্রায় ৩৫০ টাকা আর নিগ্রো ছেলেদের জন্যে ৬০ টাকা। তেমনি লুইসিয়ানা রাজ্যে শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের জন্যে মাথাপিছু বরাদ্দ ৬০০ টাকা আর নিগ্রো ছেলেদের জন্যে ২৩০ টাকা।

বলতে পারো, সে যাই হোক, আইনের চোখে তো এরা সমান। তাও কিন্তু ঠিক নয়। দক্ষিণ অঞ্চলে আইন হলো শ্বেতাঙ্গ শাসকদের হাতের বন্দুকে—তা ওয়াশিংটনে তৈরি আইনের বইয়ে যাই লেখা থাক। লক্ষ লক্ষ নিগ্রো তাই কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে ভোট দিতে যেতে ভয় পায়। আর পাবে নাই বা কেন? শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কোনো ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করার জন্যে হাজার হাজার নিগ্রো কুকুরের মতো মরেছে আততায়ীর গুলিতে কিংবা জলন্ত আগুনে বা ফাঁসিতে—আদালতের রায়ে নয়, শ্বেতাঙ্গ শাসকদের গুণ্ডামির যূপকাষ্ঠে। এইভাবে নিগ্রো হত্যাকে বলে লিঞ্চিং। এবং শুনে কি আশ্চর্য হবে যে ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে সরকারী হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে এই রকম ২০০০ লিঞ্চিং-এর কাহিনী! আরও কতো লিঞ্চিং যে সরকারী হিসেবে নেই, তা কে বলবে।

নিগ্রো ভাগচাষী আর খেতমজুরদের কথা আগেই বলেছি। মার্কিনদেশে যে নিগ্রো শ্রমিকরা বড়ো বড়ো কারখানায় কাজ কাজ করে তাদের অবস্থা কী? খেতমজুর যেমন বঞ্চিত তেমনি বঞ্চিত বড়ো বড়ো কারখানার নিগ্রো শ্রমিক। ১৯৪৮ সালের হিসেব নিয়ে দেখা যায় যে, যদি বিভিন্ন কারখানায় নিগ্রো শ্রমিকের বদলে শুধু শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক থাকতো তবে কল-মালিকদের

বছরে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা বেশি মজুরি দিতে হতো। কারণ, একই কাজের জন্যে নিগ্রো শ্রমিক শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের থেকে মজুরি পায় কম। কাজেই দেখো, নিগ্রো শ্রমিকদের শোষণ করে মার্কিন পুঁজিপতিরা কীভাবে তাদের অতিরিক্ত মুনাফা বাড়াচ্ছে।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক শোষণের চেয়েও মারাত্মক এই নিগ্রো পীড়নের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ফল। এই নিগ্রো পীড়ন মার্কিন সভ্যতার বুকের মধ্যে এক বিষাক্ত ক্ষতের মতো। এর বিষ সমস্ত দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে নিরত। যে মানুষরা অন্য অবস্থায় মানুষ হতে পারতো, এই বিষ তাদের পশুর অধম করে রাখে। যে সভ্যতা মানুষের গায়ের রঙ কালো বলে মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় সে সভ্যতা আবার সভ্যতা কি ? মার্কিনদেশের জনসাধারণের মধ্যে যারা মহৎ তাঁরা অবশ্য এই কথা বোঝেন। তাই মার্কিনদেশের সত্যিকারের প্রগতিশীল সব রাজনৈতিক দলের একটি দাবি হলো নিগ্রো পীড়নের অবসান—সাদা-কালোর সাম্য।

গত পনেরো বছর ধরে নিগ্রো জাতির মধ্যে এক নব-জাগরণের ঢেউ এসেছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নিগ্রো জাতির সাম্যের ও আত্মসম্মানের লড়াই এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই নব-জাগরণের প্রতীক নিগ্রো মনীষী ডাঃ ডব্লিউ. ই. বি. ডুবয়, বিশ্ববিখ্যাত গায়ক পল রোবসন, বিখ্যাত নিগ্রো লেখক ল্যাঙ্গসটন হুজেস। এই নব-জাগরণকে রোধ করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উঠে পড়ে লেগেছে। পল রোবসনকে নানাভাবে পীড়ন করছে ও জেলে পোরার চেষ্টা করছে। মার্কিন দেশের

শ্রেষ্ঠ মনীষী ডাঃ ডুবয়কে হাতকড়ি লাগিয়ে জেলে পুরে লাঞ্ছিত করেছে। নিগ্রো সাম্যের এবং বিশ্বশান্তির সবথেকে বড়ো যোদ্ধা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত করেছে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেছে।

॥ ব্রিটিশ গিয়ানার কথা ॥

গত বৎসরের শেষে দক্ষিণ আমেরিকার ছোট্ট দেশ ব্রিটিশ গিয়ানার কথা হঠাৎ খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হরফে লেখা হতে লাগলো। কারণ কী? কারণ সেখানকার জনপ্রিয় সরকারের শাসনে বিরক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে, জনপ্রিয় সরকারকে মন্ত্রিত্বচ্যুত করে, খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত করলো। এই দেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ জগন ও অন্য এক মন্ত্রী বার্নহাম অনেকদেশ ঘুরে ভারতে এলেন। তাঁরা ভারতের লোকসভায় বক্তৃতা করেন। যেখানেই ডাঃ জগন বা মিঃ বার্নহাম গেলেন সেইখানে আমাদের দেশের হাজার হাজার লোকে তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা জানালো।

'জানবার কথা'য় ব্রিটিশ গিয়ানার কথা উল্লেখ করছি এই জন্যে যে, এই ঘটনা থেকে আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু। যেমন ধরো, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের প্রথম অভিযোগ যে, ব্রিটিশ গিয়ানায় নাকি কমিউনিষ্ট কার্যকলাপ ভীষণ বেড়ে চলেছিলো, কমিউনিষ্টরা নাকি সশস্ত্র বিপ্লব করবার চেষ্টা করছিলো এবং ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত

করলো এই জন্যে তা না করলে এই কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র নাকি ঠেকানোর আর কোনো উপায় ছিলো না।

একথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে, ব্রিটিশ সরকার কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের একটি নিদর্শনও আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি। তবু তারা এরকম করলো কেন? ব্রিটিশ সরকার এই স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করলো কেন তার জবাব আমরা পাবো যদি দেখি যে, ডাঃ জগনের মন্ত্রিসভা কী কী কাজ করার চেষ্টা করছিলো, কী কী কাজ করেছিলো।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ গিয়ানার মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ১৯৩৫ সালে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যে রকম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় অনেকটা সেই-রকমভাবে। অর্থাৎ দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শাসন অটুট ছিলো এবং দেশের জনসাধারণের হাতে ছিলো সামান্য ক্ষমতা। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ গিয়ানায় সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনের উপলক্ষে ডাঃ জগনের পিপলস্ প্রগেসিভ পার্টি একটি নির্বাচনী ইস্তাহার দেয়। এই নির্বাচনী ইস্তাহারে পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি বলে যে, যদি তারা মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে তবে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রোধ করে এই রকম যে-সব আইন গিয়ানায় চালু আছে সেগুলিকে এরা নাকচ করবে। ধর্ম অথবা জাতির ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করা চলবে না এই মর্মে আইন পাশ করবে ও প্রেসের, ধর্মবিশ্বাসের, বক্তৃতার ও সংগঠন তৈরি করবার স্বাধীনতা গিয়ানার জনসাধারণ যাতে পায় তার ব্যবস্থা করবে।

পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি এই ইস্তাহারের জোরে বিরাট

ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। এই জয় কী রকম তার আন্দাজ পাবে একটি ঘটনা থেকে। পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি যা ভোট পায় তা অন্য সবথেকে জোরালো প্রতিযোগী পার্টির চেয়ে ১৫ গুণ বেশি ছিলো।

নির্বাচনে জয়লাভ করে পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে নির্বাচনী ইস্তাহারে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো সেইগুলিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক তাদের কাজের ফিরিস্তি : ১। প্রগতিশীল সাহিত্যকে বাজেয়াপ্ত করা চলবে না এই মর্মে একটি আইন পাশ ২। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে যে সমস্ত বৈষম্য তার কিছু কিছু দূর করে একটি আইন পাশ। ৩। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মালিক শ্রেণী সরাসরি কথাবার্তা ও আলোচনা করে সব রকম মালিক-শ্রমিক বিবাদের সমাধানের চেষ্টা করবে এই মর্মে আইন পাশ। ৪। চাষীদের জন্যে ঋণের টাকার বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া। ৫। জলাভাবে চাষীদের কষ্ট ও ক্ষতি যাতে কম হয় সেই মর্মে সরকারের তরফ থেকে চাষীদের প্রতি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। ৬। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যেন গির্জার অধীন না থাকে সেই উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু করা ৭। বিভিন্ন খাতে খরচ কমানোর চেষ্টা। ৮। বড়ো বড়ো সরকারী কর্মচারীদের জন্যে সরকারী টাকায় বাড়ি তৈরির প্রস্তাব রদ। ৯। গরিবরা যাতে ডাক্তারদের সাহায্য পায় সেই জন্যে সরকারী চিকিৎসকদের ফি কমিয়ে দেওয়া। ১০। স্বায়ত্ত-শাসন সংগঠনগুলিতে সরকারী মনোনীত আসন উঠিয়ে

দিয়ে সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা। ১১। স্থানীয় বাসিন্দাদের পুলিসের ও অন্যান্য কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার সাব্যস্তের চেষ্টা। ১২ ইংল্যাণ্ডের রানী জামাইকায় এলে তার অভ্যর্থনায় সরকারী প্রতিনিধি না পাঠানো। ১৩। সরকারী জমি বড়ো বড়ো জমিদারদের ভাড়া দিতে অস্বীকার করা। ১৪। নতুন যে হাইড্রো-ইলেকট্রিক ষ্টেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসে তার ওপর সরকারী রয়ালটি বাড়িয়ে দেওয়া। ১৫। যে সমস্ত কোম্পানি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদের অধিকারী তাদের ওপর সরকারী করার বাড়ানোর প্রস্তাব পেশ করা।

এই রকম কাজ চালিয়ে যায় ডাঃ জগনের মন্ত্রিসভা এবং নির্বাচনের পর জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখে। যখনই ব্রিটিশ গভর্ণর মন্ত্রিসভার কাজে নানা রকম বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তখন সে ব্যাপারটা চেপে না গিয়ে জনসাধারণের সামনে সমস্ত ঘটনা খুলে ধরতে থাকে। গভর্ণর ও ঐ-জাতীয় ব্রিটিশ সরকারী চাকুরেদের সঙ্গে দহরম-মহরম একেবারেই করে না।

এই কাজগুলি করার জন্যে ডাঃ জগনের মন্ত্রিসভা কতোদিন সময় পেয়েছিলো? মাত্র চার মাস। এই ৪ মাসের এই কার্য-কলাপ দেখেই ব্রিটিশ সরকার ভয় পেয়ে গেলো। কারণ, পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি গিয়ানার জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে রাজী হলো না।

কাজেই তাদের হাতে অস্ত্র রইলো একটি : কোনো রকমে

কোনো ছুতোয় মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করা। কিন্তু যখন কোনো ছুতোই পাওয়া গেলো না তখন সোজাসুজি খোলাখুলি স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠা করলো, মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলো এবং তারপর বলতে আরম্ভ করলো যে, কমিউনিষ্টরা নাকি সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করছিলো।

ব্রিটিশ গিয়ানার জনসাধারণ এই সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের এই ৮ মাসের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথিবীর সমস্ত ঔপনিবেশিক জনসাধারণ অনেক কিছু শিখেছে। ঔপনিবেশিক জনতার কাছে আজ একথা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার রাস্তা। সাম্রাজ্যবাদের সংকট এতোই গভীর যে সাম্রাজ্যবাদী আওতায় বসে জনসাধারণের সত্যকার উপকার কিছু করা প্রায় অসাধ্য। এবং কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থান ইত্যাদি মিথ্যা প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদীরা গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ চালায় এ কথা ক্রমেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কোরিয়ার কথা

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বীভৎস পাশবিকতার কথা লেখা আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা আছে অনেক অমর উজ্জ্বল দেশপ্রেমের কাহিনী, স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ লড়াইয়ের কথা। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই পর্যন্ত (ঐ দিন পানমুনজনে কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়) কোরিয়া দেশে মার্কিন ও পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে সাম্রাজ্যবাদী পাশবিকতার তাণ্ডব চালিয়েছিলো তার তুলনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে একমাত্র ইউরোপের বুকে ফ্যাসিজ্ম-এর তাণ্ডবে পাওয়া যায়। তেমনি কোরিয়ার জনসাধারণ চাষী, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক এই সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে তার কথা মানুষের সহস্রাধিকবর্ষব্যাপী স্বাধীনতার লড়াইয়ের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৫০ সালের ২৫শে জুন তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সিংম্যান রী সরকার উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করেছিলো এ কথা আজ আর কারুরই অজানা নেই। এই আক্রমণের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছিলো যে, বোধ হয় উত্তর কোরিয়াই দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছে। আজ সকলেরই সে ভুল ভেঙেছে। হাজার হাজার তথ্য এসেছে সকলের সামনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্তর কোরিয়ার ওপর আক্রমণের

অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বুঝবে। উত্তর কোরিয়া আক্রমণের তিনমাস আগে যখন আক্রমণের জন্যে তোড়জোড় চলেছে পুরো দমে দক্ষিণ কোরিয়ায়, তখন এই আক্রমণের তোড়জোড় সম্বন্ধে একেবারে চুপচাপ না থাকার অপরাধে দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভার ১৩ জন সদস্যের দেড় বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। এই ১৩ জন সদস্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধ আরোপ করা হয় তার মধ্যে একটি ছিলো "দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বারা উত্তর কোরিয়া আক্রমণে বাধা দান"।

কিন্তু কেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করলো? এর জবাব পেতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে গুটিকয়েক কথা।

চীনদেশ থেকে মার্কিন কুকুর চিয়াং কাই-শেক পলায়ন করলো। ১৯৪৯ সালে সমস্ত চীনদেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হলো চীনদেশের গণতান্ত্রিক সরকার। সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুণলো। সাম্রাজ্য-বাদের কবল থেকে বেরিয়ে গেলো ৬০ কোটি লোকের একটি বিরাট বাজার যেখান থেকে সে লুট করতো কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর।

মার্কিন নৌবাহিনী চিয়াং কাই-শেককে ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে আশ্রয় দিয়ে পাহারা দিতে লাগলো! চীনদেশের গণতান্ত্রিক সরকার ফরমোজা দ্বীপ চীনদেশেরই চিরাচরিত অংশ হিসেবে গণ্য হবে এই কথা পৃথিবীর প্রত্যেকটি সরকারকে জানালেন এবং চিয়াং কাই-শেককে এইভাবে মার্কিন আওতায়

রাখার প্রতিবাদ করলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভাবলো, ভালোই হলো : ফরমোজা দ্বীপ নিয়েই চীনদেশের সঙ্গে লড়াই শুরু করা যাবে। তাই তারা মার্কিনদেশ থেকে তাড়াতাড়ি বহু অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে লাগলো ফরমোজায়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে খবর পাওয়া গেলো যে, মার্কিনদেশ থেকে ফরমোজায় কমপক্ষে ৪৫ কোটি টাকার যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে।

কিন্তু চীনদেশের সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই মতলব বুঝে ফরমোজা দ্বীপ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যাতে কিছুতেই যুদ্ধের আগুন না লাগাতে পারে তার বন্দোবস্ত করলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বোকা বনে অন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে তাদের চোখ পড়লো ছোট্ট দেশ কোরিয়ার ওপর।

কোরিয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্তত আট বার চীনদেশ ও রাশিয়া আক্রমণ করেছিলো। এই পথেই সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনদেশকে আক্রমণ করে ১৯০৫ সালে কোরিয়া দখল করার পর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক করলো, ঐ পথেই তারাও চালাবে চীনদেশের ওপর আক্রমণ। কিন্তু কবে? দেরি তো আর সয় না! কারণ যতোই দিন যায় ততোই শক্তিশালী হয়ে ওঠে চীন। নতুন চীন সরকারকে ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের সরকার ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে। প্রত্যেকদিন চীনদেশে চলেছে বিরাট পরিবর্তনের সমারোহ। কাজেই দেরি করার বিড়ম্বনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বুঝতে বাকি রইলো না।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের পর কোরিয়াবাসী নিজেদের

দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করলো ১৯৪৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে। যেমনভাবে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ চালিয়েছিলো ইন্দোচীনের ওপর, ঠিক তেমনিভাবেই আক্রমণ চালালো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়ার এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ওপর। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিনদেশ থেকে নিয়ে এসে বসালো সিংগ্যাম রীকে দক্ষিণ কোরিয়ার গদিতে এবং মার্কিন-তাঁবেদার সরকার গঠন করলো। উত্তর কোরিয়ায় এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জয়ী হলো, কারণ সোবিয়েত সৈন্যবাহিনীর ভয়ে মার্কিন সৈন্যবাহিনী উত্তর কোরিয়ায় নিজেদের রাজ্য গঠনের চেষ্টা করতে পারলো না।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়া থেকে সমস্ত সোবিয়েত ফৌজ বিদায় নিলো। এর পর উত্তর কোরিয়ায় নির্বাচনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যবাহিনী রইলো ১৯৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত। মার্কিন সৈন্য বিদায় নেবার পর প্রতিষ্ঠিত হলো মার্কিন-তাঁবেদার সিংগ্যাম রী সরকারের একচ্ছত্র শাসন। এই রী সরকার দক্ষিণ কোরিয়ায় যে পাশবিক অত্যাচার চালাতে থাকলো তার একটি প্রমাণই যথেষ্ট। ১৯৫০ সালের মধ্যে ১৪৯০০০ স্বাধীনতাকামী দক্ষিণ কোরিয়াবাসীকে রী সরকার হত্যা করলো বিভিন্ন অজুহাতে। কিন্তু রী সরকারের অবস্থা দিনের পর দিন আরও সঙ্গীন হতে থাকলো। কারণ প্রতিদিনই দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ শুনতে লাগলো উত্তর কোরিয়ার অগ্রগতির কথা ও দেখতে লাগলো দক্ষিণ কোরিয়ার দুঃখ-

দুর্দশা। রী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগলো। রা সরকারকে এই সংকট থেকে বাঁচানোর জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগলো।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে উত্তর কোরিয়া আক্রমণ জরুরী হয়ে উঠলো আরও অনেক কারণে। যথা, ১৯৪৯ সালে মার্কিনদেশে এক বিরাট অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলো। পৃথিবীময় শান্তির আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো। ১৯৫০ সালের মে মাসের মধ্যে ২০ লক্ষ মার্কিন-দেশবাসী বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ষ্টকহোম আবেদনে সই দিলো। মার্কিনদেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনসাধারণের সামনে একটি যুদ্ধসংকট খাড়া করার প্রয়োজনীয়তা মার্কিন সরকার বুঝতে লাগলো। ১৯৫০ সালের মে মাসে জাপানে যে নির্বাচন হলো তাতে পরিষ্কার হলো যে, জাপানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালানো ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যখন কোরিয়া দখল করে তখন তারা ওরিয়েণ্টাল ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানি তৈরি করে কোরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা লোহা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, সিসে প্রভৃতির খনির দখলদারি করবার জন্যে। মার্কিন কোটিপতি কোম্পানি জে. পি. মর্গান জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর এই ওরিয়েণ্টাল ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানিটি দখল করে। কিন্তু এইসব খনিগুলি উত্তর কোরিয়ায় অবস্থিত হওয়ার ফলে জে. পি. মর্গান কোম্পানির এই ৭৫০ কোটি টাকার বিষয়টি বৃথাই হয়। উত্তর কোরিয়ার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করতে না পারলে

এই বিষয়টি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভোগে লাগানোর কোনোই উপায় এদের চোখে পড়লো না।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়া ও তারপর চীনদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা করলো। ২৫শে জুন রবিবার এই আক্রমণ শুরু হয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিলো, কোরিয়াকে ধ্বংস করতে বড়ো জোর মাস তিনেক লাগবে। কিন্তু তিন বৎসর যুদ্ধের পরেও যুদ্ধের কোনো শেষ দেখা গেলো না।

১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে এমন অবস্থা হলো যে মার্কিন সৈন্যবাহিনী বুঝি চিরদিনের মতো পরাজিত হয়। ভীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। কোরিয়ার বুকের ওপর শুরু হলো বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের তাণ্ডব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নেতৃত্বে মাঞ্চুরিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করলো। চীন সরকারের হুঁশিয়ারি অবজ্ঞা করে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী ইয়ালু নদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে চীনদেশের ভলানটিয়ার বাহিনী উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় পুনরাক্রমণ করলো। সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী এই আঘাতে চুরমার হয়ে পালাতে লাগলো।

মদোন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী মহলে শুরু হলো সংশয় ও নানাপ্রকার বিরোধ। যারা ভেবেছিলো জয় সুনিশ্চিত, পরাজয়ের আশঙ্কায় তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। মার্কিন

সৈন্যবাহিনীর চিরাচরিত ঐতিহ্য হলো কাপুরুষতার। পরাজয়ের আশঙ্কায় এই কাপুরুষ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরলো।

এশিয়ার বিভিন্ন সরকারের বিরোধিতা সত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনদেশকে ইউনাইটেড নেশনস-এর সভায় আক্রমণকারী বলে অভিযুক্ত করলো এবং পরাজয়ের গ্লানিকে ঢাকা দেবার জন্যে আণবিক বোমা ব্যবহার করবার হুমকি দিতে লাগলো। ১৯৫০—৫১ সালের শীতকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুনরাক্রমণ শুরু করলো, কিন্তু পুনরাক্রমণের কোনোই ফল হলো না।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার বলতে লাগলো যে, কোরিয়ার যুদ্ধে জিততে হলে একই সঙ্গে চীন ও সোবিয়েত দেশের ওপর আক্রমণ করা দরকার। এই উক্তিতে পৃথিবীময় প্রতিবাদ দেখা দিলো এবং এই প্রতিবাদের সামনে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ম্যাক-আর্থারকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হলেন। ম্যাক-আর্থার বিদায় গ্রহণ করলো।

কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীনদেশ, এমন কি ভারতবর্ষও শান্তির চেষ্টা শুরু করে। বারবার সোবিয়েত ইউনিয়ন ও চীন শান্তির প্রস্তাব করে, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বলতার চিহ্ন ভেবে প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যেকটি শান্তির আবেদনকে।

ইতিমধ্যে মার্কিনদেশে সাধারণ নির্বাচন এলো। ট্রুম্যান গিয়ে আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৫০-৫১ সালের আক্রমণের মতো জেনারেল ক্লার্ক ও ভ্যান ফ্লিটের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের মার্কিন পুনরাক্রমণ ব্যর্থ হলো। মার্কিন সৈন্যদের উৎসাহ দেবার জন্যে নতুন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ১৯৫৩ সালে

এই বিষয়টি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভোগে লাগানোর কোনোই উপায় এদের চোখে পড়লো না।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়া ও তারপর চীনদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা করলো। ২৫শে জুন রবিবার এই আক্রমণ শুরু হয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিলো, কোরিয়াকে ধ্বংস করতে বড়ো জোর মাস তিনেক লাগবে। কিন্তু তিন বৎসর যুদ্ধের পরেও যুদ্ধের কোনো শেষ দেখা গেলো না।

১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে এমন অবস্থা হলো যে মার্কিন সৈন্যবাহিনী বুঝি চিরদিনের মতো পরাজিত হয়। ভীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। কোরিয়ার বুকের ওপর শুরু হলো বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের তাণ্ডব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নেতৃত্বে মাঞ্চুরিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করলো। চীন সরকারের হুঁশিয়ারি অবজ্ঞা করে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী ইয়ালু নদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে চীনদেশের ভলানটিয়ার বাহিনী উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় পুনরাক্রমণ করলো। সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী এই আঘাতে চুরমার হয়ে পালাতে লাগলো।

মদোন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী মহলে শুরু হলো সংশয় ও নানাপ্রকার বিরোধ। যারা ভেবেছিলো জয় সুনিশ্চিত, পরাজয়ের আশঙ্কায় তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। মার্কিন

সৈন্যবাহিনীর চিরাচরিত ঐতিহ্য হলো কাপুরুষতার। পরাজয়ের আশঙ্কায় এই কাপুরুষ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরলো।

এশিয়ার বিভিন্ন সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনদেশকে ইউনাইটেড নেশনস-এর সভায় আক্রমণকারী বলে অভিযুক্ত করলো এবং পরাজয়ের গ্লানিকে ঢাকা দেবার জন্যে আণবিক বোমা ব্যবহার করবার হুমকি দিতে লাগলো। ১৯৫০—৫১ সালের শীতকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুনরাক্রমণ শুরু করলো, কিন্তু পুনরাক্রমণের কোনোই ফল হলো না।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার বলতে লাগলো যে, কোরিয়ার যুদ্ধে জিততে হলে একই সঙ্গে চীন ও সোবিয়েত দেশের ওপর আক্রমণ করা দরকার। এই উক্তিতে পৃথিবীময় প্রতিবাদ দেখা দিলো এবং এই প্রতিবাদের সামনে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ম্যাক-আর্থারকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হলেন। ম্যাক-আর্থার বিদায় গ্রহণ করলো।

কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীনদেশ, এমন কি ভারতবর্ষও শান্তির চেষ্টা শুরু করে। বারবার সোবিয়েত ইউনিয়ন ও চীন শান্তির প্রস্তাব করে, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বলতার চিহ্ন ভেবে প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যেকটি শান্তির আবেদনকে।

ইতিমধ্যে মার্কিনদেশে সাধারণ নির্বাচন এলো। ট্রুম্যান গিয়ে আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৫০-৫১ সালের আক্রমণের মতো জেনারেল ক্লার্ক ও ভ্যান ফ্লিটের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের মার্কিন পুনরাক্রমণ ব্যর্থ হলো। মার্কিন সৈন্যদের উৎসাহ দেবার জন্যে নতুন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ১৯৫৩ সালে

নিজেই কোরিয়ায় গেলেন। তারপর শুরু হলো শীতকালের মার্কিন আক্রমণ। কিন্তু তাতেও কোরিয়াকে হার মানানো গেলো না। অগত্যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হলো শান্তির চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত কোরিয়াদেশ ছারখার হয়ে গেছে। কিন্তু কোরিয়ার স্বাধীনতা-কামী মানুষ হার মানেনি, হার মেনেছে দস্যু সাম্রাজ্যবাদীরা। ১৯১৯ সালে যখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম বেড়ে ওঠে তখন জাপানী শাসকরা ৩৬০২৬১ কোরিয়াবাসীকে গুলি করে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিলো। একথা জাপানীরা নিজেরাই স্বীকার করে। মার্কিন শাসকরা কমপক্ষে ৩০০০০০০ কোরিয়াবাসীকে গুলি করে, বোমা মেরে, আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়াবাসীর ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিলো তার উদ্দেশ্য ছিলো কোরিয়াবাসীকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই পাশবিকতার কোনো তুলনা আছে কিনা সন্দেহ এবং সমস্ত রকম চেষ্টা সত্ত্বেও এই পাশবিকতার কথা পৃথিবীর জনসাধারণের অগোচর রাখা সম্ভব হয়নি।

উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিঅঙইআঙ থেকে পালাবার আগে মার্কিন ফৌজ রাজধানীর প্রত্যেকটি বাড়ি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। শত শত গ্রাম ও খেতকে বিমান থেকে নাপলাম বোমা ফেলে পুড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার নরনারী-শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারে মার্কিনদেশের সৈন্যরা। এতেও মার্কিন দস্যুদের রক্তপিপাসা মেটে না। চীনদেশের ওপর বিমান থেকে সংক্রামক

ব্যাধির বীজ ছড়ানোর চেষ্টা করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পিছপাও হয়নি। কোজে দ্বীপে যুদ্ধবন্দীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালায় মার্কিন সামরিক পুলিস তার মতো নিষ্ঠুর বর্বরতার কাহিনী ইতিহাসে কমই মেলে।

কিন্তু এই বীভৎসতার সামনে উত্তর কোরিয়ার সরকার বা চীনদেশের ভলানটিয়ার বাহিনী শুধু পিছপাও হয়নি তা নয়, এর উত্তরে তারা পশুর স্তরে না নেমে বারবার চেষ্টা করেছে শান্তির, চেষ্টা করেছে যুদ্ধবন্দীদের বোঝাতে যে কোরিয়ার ওপর এই আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ; সাম্রাজ্যবাদ শুধু কোরিয়াবাসীর শত্রু নয়, সমস্ত মানুষ জাতির শত্রু।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়ায় কেন পরাজিত হলো ? কারণ, কোরিয়ার মানুষ লড়েছিলো স্বাধীনতার লড়াই, এবং আজ জাগ্রত এশিয়ার যেখানেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মাথা গলাতে যাবে সেইখানেই তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াবে জাগ্রত এশিয়ার স্বাধীনতা-কামী মানুষ। এই জাগ্রত মানুষের পরাজয় নেই।

চীন-ভারত মৈত্রী : এশিয়ার শান্তি চিরস্থায়ী হোক

১৯৪৭ সালের পরেও ভারতবর্ষে বিদেশী পুঁজি কী পরিমাণে থেকে গিয়েছে তার হিসেব ৩৩ থেকে ৩৫ পাতায় দেখেছো। এই হিসেব থেকেই প্রমাণ হয় ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয় নি।

এই সাম্রাজ্যবাদ সারা এশিয়া জুড়ে যুদ্ধের চক্রান্ত করে চলেছে এবং দিনের পর দিন চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকেও সেই যুদ্ধচক্রান্তের মধ্যে টেনে আনতে।

কিন্তু ১৯৫৪ সালে ভারতের ইতিহাসে একেবারে নতুন এক অধ্যায় শুরু হলো, এমন এক সম্ভাবনা দেখা দিলো যার ফলে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে।

কী ঘটনা ঘটলো যার সম্ভাবনা এতোখানি? চীন-ভারত মৈত্রী চুক্তির স্বাক্ষর হলো।

এই ঘটনাটির পেছনে নানান কারণ আছে। কয়েকটি জরুরী কারণ এখানে উল্লেখ করা যাক।

১॥ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় নি বলেই দেশের অর্থনৈতিক সংকট দিনের পর দিন তীব্র হয়েছে। প্রমাণ? ক) প্রতি বছর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষ থেকে ১১০ কোটিরও বেশি টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, ফলে দেশের অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সঙ্গীন,। খ) দেশে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হতে পারছে না। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি বোঝা যায় লোহা আর ইস্পাত শিল্পের অবস্থা থেকে। কেননা সব রকম কলকারখানা গড়বার মূলেই ইস্পাতের প্রয়োজন। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে ইস্পাত-শিল্পের খুব কিছু উন্নতি হয় নি। গ) সাধারণ মানুষের পক্ষে জিনিসপত্র কেনবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, হু হু করে বেড়েছে জিনিসের দাম : ১৯৩৭ সালে যে-জিনিসের দাম ছিলো, ধরো ১০০ টাকা, ১৯৪৭ সালে তার দাম হলো ৩০৩ টাকা এবং ১৯৫১ সালে দাঁড়ালো ৪৫৬ টাকা। ঘ) দেশে বেকারের সংখ্যা হু হু

করে বেড়েছে : বেকারি-দপ্তরে ইতিমধ্যেই ৫ লাখের বেশি মানুষ নাম লিখিয়েছে, কিন্তু বেকারদের মধ্যে কজনই বা দপ্তরে নাম লেখাতে যায় ?

২ ॥ এরই পাশাপাশি অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী-শোষণমুক্ত দেশগুলিতে—বিশেষ করে নতুন চীনে—প্রগতির সমারোহ কী আশ্চর্য ! তার কিছু কিছু হিসেব এই বইয়েরই অন্যত্র, এবং জানবার কথার অন্যান্য বইতেও, দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে চীনের অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর মনে দারুণ আশাভরসা সঞ্চার করেছে।

৩ ॥ এশিয়ার বুকে যুদ্ধ বাধাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত দিনের পর দিন অতি ভয়াবহ বীভৎসতা সৃষ্টি করে চলেছে ! ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় মার্কিন যুদ্ধ-চক্রান্ত চরমে উঠলো।

চীন-ভারত মৈত্রী চুক্তির পিছনে এই জাতীয় নানান কারণ রয়েছে।

১৯৫৪ সালের গোড়ায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির খবরে ভারতবর্ষে বিক্ষোভ দেখা দিলো। ভারতবর্ষকে মার্কিন যুদ্ধ-চক্রান্তে জোর করে নামাবার এই ঘৃণিত চেষ্টা এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের করাল ছায়ার বিস্তারে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী পাক-মার্কিন যুদ্ধচুক্তির নিন্দা করে। কিছুদিন পরে ভিয়েতনামে যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খোলাখুলি হস্তক্ষেপের আশঙ্কা দেখা দিলো তখন ভারত সরকারের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীদের সভায় মার্কিন হস্তক্ষেপ-বিরোধী একটি প্রস্তাব

গৃহীত হলো।

ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা এই সময় জেনেভার সভায় ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিতা ও তৎপরতা দেখালেন।

এর কিছুদিন আগেই সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনাকে ব্যর্থ করে তিব্বতদেশ নিয়ে ভারতবর্ষ ও চীন সরকারের মধ্যে মৈত্রীমূলক চুক্তি সম্পাদিত হলো এবং জেনেভার সভার সাফল্যের পর চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই ভারতবর্ষে এলেন ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে।

এই চৌ-নেহেরু সাক্ষাৎকার পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী জনসাধারণের মধ্যে স্বভাবতই উৎসাহের সঞ্চার করলো। ১৯৫৪ সালের ২৮শে জুন তারিখের চৌ-নেহেরু বিবৃতিতে বলা হলো—

১। দুই প্রধান মন্ত্রীর আলোচনার লক্ষ্য ছিলো, জেনেভায় এবং অন্যস্থানে বিশ্বশান্তি রক্ষার যে প্রচেষ্টা চলছে সেই প্রচেষ্টা-গুলিকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়।

২। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আরও ওয়াকিবহাল হওয়া যাতে তাঁদের উভয়ের চেষ্টায় ও অন্যান্য শান্তিকামীদের সহিত সহযোগিতায় শান্তি বজায় থাকে।

৩। পৃথিবীতে এবং এশিয়া মহাদেশে বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতির ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে। এই সত্যকে ঢাকা দেবার কোনো চেষ্টা না করে উভয় প্রধান মন্ত্রীর মতে যদি নিম্নলিখিত পাঁচটি মূলনীতিকে স্বীকার করা যায় তবে শান্তি রক্ষা করা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের বন্ধুভাবে

জীবন যাপন করা সম্ভব হবে।

৪। চীন-ভারত মৈত্রী যে এশিয়া মহাদেশে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করবে এ কথা দুই প্রধান মন্ত্রীই বিশ্বাস করেন।

৫। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয় তার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করার সিদ্ধান্ত দুই প্রধান মন্ত্রীই গ্রহণ করেন।

যে পাঁচটি মূলনীতির কথা দুই প্রধান মন্ত্রীই উল্লেখ করেন সেই পাঁচটি মূলনীতি তিব্বত সম্বন্ধে চীন-ভারত চুক্তির মুখবন্ধ হিসেবে রাখা হয়েছিলো। সেগুলি হলো :

১॥ পরস্পরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও দেশভূমির প্রতি শ্রদ্ধা। ২॥ এক রাষ্ট্র অন্যকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি। ৩॥ পরস্পরের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। ৪॥ সমতা ও পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধি। ৫॥ পরস্পরের মধ্যে শান্তিময় সম্বন্ধ।

চৌ-নেহেরু এই যুক্ত বিবৃতি এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও শান্তির সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের সূচক।

কিন্তু শুধুমাত্র একটি চুক্তিতে সই হওয়াই সব নয়। মনে রাখতে হবে, দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের নানা অনুচর রয়েছে, তারা চেষ্টা করবে এই চুক্তিকে বানচাল করে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খোরাক করতে। তাই শান্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতবাসীকে আজ পণ করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী সমস্ত ষড়যন্ত্র পরাস্ত করবো। মহান চীন ও মহান ভারত—এই দুই দেশের মৈত্রী এশিয়ার স্বাধীনতার ও পৃথিবীর শান্তির জামিন হয়ে উঠুক।



ম্যাপের কালো অংশে নতুন দিনের আলো

নতুন মানুষের জগৎ

এতোক্ষণ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের কথা পড়েছো আর পড়েছো এরই বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মরণপণ স্বাধীনতার লড়াই। পড়তে পড়তে হয়তো অবাক হয়ে ভেবেছো : কী দুর্জয় মানুষের আশা, কী বিরাট মানুষের স্বপ্ন! সেই আশায় বুক বেঁধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে দিনের পর দিন

স্বাধীনতার জন্যে, সাম্যের জন্যে, মৈত্রীর জন্যে।

আজ বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হয়ে গেছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় এই স্বাধীনতার, এই সাম্যের আর মৈত্রীর কথা সত্যেই স্বপ্নের মতো শোনাতো। কিন্তু আজ সেই স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে। আজ পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ছিড়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের যাত্রা এক নতুন জগৎ, এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশে। এই সমাজতন্ত্র ও নয়া গণতন্ত্রের অগ্রগতি দেখে সাম্রাজ্যবাদীরা ভয়ে কাঁপছে, একে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিক এই নতুন সভ্যতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কারণ বিশ্বজোড়া এই নতুন জগৎই, স্বাধীনতার দুর্গ এই নতুন মানুষই, স্বাধীনতার লড়াইয়ের অগ্রগামী সৈনিক।

সমাজতন্ত্রে একটি মূল কথা হলো এই যে, যে-জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে সে জাতি কখনো সত্যকার স্বাধীনতা পেতে পারে না। যে-জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে তার পক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব।

এই কথাটা যে কতো খাঁটি তার প্রমাণ আমরা পাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে। আজকের দিনের ফরাসীদেশ বা ইংল্যাণ্ড। এই দুই দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে, উপনিবেশসমূহের জনতার স্বাধীনতার দাবিকে ন্যায্য দাবি বলে স্বীকার করে নিয়ে নিজের নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে কারা? ইংল্যাণ্ড

বা ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রীরা এবং তাদের নেতৃত্বে হাজার হাজার শান্তিকামী মানুষ। অবশ্য এখানে সমাজতন্ত্রী বলতে আমি সাচ্চা সমাজতন্ত্রীদের কথাই বলছি—যারা শুধু মুখেই সমাজতন্ত্র বলে তাদের কথা বলছি না।

এর কারণ কী? কারণ এই যে, নিজের নিজের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চালাতে চালাতে এরা দেখেছে যে, যতোদিন নিজের দেশের সরকার উপনিবেশসমূহে শোষণ চালিয়ে যায় ততোদিন এই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে নিজের নিজের দেশের সমাজতন্ত্রবাদী শক্তিগুলিকে দাবিয়ে রাখা, তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা, তাদের দিয়ে যুদ্ধ চালানো ইত্যাদি সম্ভব হয়। আর সাম্রাজ্যবাদ যতোই উপনিবেশসমূহে কোণঠাসা হয়, যতোই উপনিবেশসমূহে অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়, ততোই এই সব দেশে সমাজতন্ত্রের লড়াই জোর পায়ে এগিয়ে চলে। তাই আজ উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতার লড়াই আর ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমাজ-তন্ত্রের লড়াই একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে—একই শত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির ঐক্যবদ্ধ লড়াই।

কথাটা আরও পরিষ্কার হবে একটি উদাহরণ দেখলে। আমরা দেখেছি যে, সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলিকে কোনো না কোনো লড়াই সব সময় চালাতে হয়। লড়াই ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বাঁচতে পারে না। হয় তাকে উপনিবেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে। কারণ অন্য রাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে সে আরও উপনিবেশ পাওয়ার আশা

রাখে। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে ধনে-প্রাণে মরে কারা? শুধু যে উপনিবেশসমূহের জনসাধারণই লাঞ্ছিত হয় তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নিজের দেশের জনসাধারণও মরে ধনে-প্রাণে।

যেমন ধরো, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কথা। ১৯৫২ সালে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের খাতে ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্যে মাত্র এক বছরে খরচ করেছে ১৬৩ কোটি পাউণ্ড বা ২১২৪ কোটির বেশি টাকা।

কিংবা ধরো মার্কিন সরকারের কথা। ১৯৫২ সালে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্রের খাতে খরচ করেছিলো ৪১৫২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার অথবা ২০৬২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মার্কিন সরকার ঠিক করেছিলো, ১৯৫৩ সালে এই যুদ্ধের বাবদে তারা খরচ করবে ৫২৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার অথবা ২৬৪৩৪ কোটি টাকা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৫২ সালে যুদ্ধের খাতে যা খরচ করেছে তার পরিমাণ সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা জন্মাবে যদি জানো যে এই খরচ ইংল্যাণ্ডের মোট জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি।

এই যে বিরাট খরচ সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলো প্রত্যেক বছর করে যাচ্ছে, এ টাকাটা আসছে কোথা থেকে? এর একটা বিরাট অংশ আসছে উপনিবেশগুলো লুট করে। কিন্তু বাকিটা? বাকিটা আসছে ইংল্যাণ্ড বা মার্কিনদেশের জনসাধারণের পকেট থেকে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাধারণ মানুষের সামনে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম: যদি যুদ্ধ লাগে তবে তো প্রাণে মরবো আমরা সাধারণ মানুষ। আর এই যুদ্ধ লাগার আগে

যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মরছি ধনে। কাজেই যদি ধনে ও প্রাণে না মরে বাঁচতে হয় তবে উপনিবেশের জনসাধারণের হাতে হাত মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে পরাস্ত করাই একমাত্র রাস্তা। আর এই কথাটা পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনসাধারণের কাছে ক্রমেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাহলে আমরা কী দেখছি? সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের যদি কেউ সমর্থক থাকে তবে তারা হলো সাচ্চা সমাজতন্ত্রবাদীরা ও তাদের নেতৃত্বে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ।

এ তো গেলো এমন দেশের কথা যে দেশে এখনও সাম্রাজ্যবাদী সরকার রাজত্ব করে। কিন্তু যে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়েছে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সে দেশের অভিজ্ঞতা কী?

এর উত্তরের জন্যে সোবিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকালেই হবে। একথা হয়তো জানো যে যে-দেশ আজকের সোবিয়েত ইউনিয়ন, সে দেশে নানা জাতির বাস। এই দেশে মাত্র ৪০ বৎসর আগে রাজত্ব করতো জার এবং এই জারের যে সাম্রাজ্য ছিলো তাতে বহু জাতের কোটি কোটি মানুষ ছিলো বন্দী।

১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব যখন সফল হলো, মহামানব লেনিনের নেতৃত্বে যখন প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এই সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রথমেই ঘোষণা করলো যে সোবিয়েত দেশে প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকার এবং যদি কোনো জাতি সোবিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে যেতে চায়

তবে সে অধিকার তার আছে।

ভাবছো হয়তো, এটা কথার কথা। কিন্তু তা যে নয় তার প্রমাণ পাবে ফিনল্যাণ্ডের কথা মনে রাখলে। ফিনল্যাণ্ড ছিলো জারের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি দেশ। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন জারের পতন হলো এবং কেরেনস্কির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো তখন ফিনল্যাণ্ডের জননেতারা দাবি করলেন যে ফিনল্যাণ্ডকে আলাদা হতে দেওয়া হোক। কেরেনস্কি মন্ত্রিসভা এই দাবি অগ্রাহ্য করলো। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের যে-সব লোক এই দাবি তুলেছিলো তারা সকলেই ছিলো ঘোর প্রতিক্রিয়াবাদী এবং ফিনল্যাণ্ডকে আলাদা করে নেওয়ার এই চেষ্টার পেছনে তাদের কোনো সৎ উদ্দেশ্য তো ছিলোই না বরং ছিলো গভীর অসৎ উদ্দেশ্য।

নভেম্বর বিপ্লবের পর যখন বলশেভিক পার্টির হাতে ক্ষমতা এলো তখন লেনিন কিন্তু সব কথা জেনেও ফিনল্যাণ্ডের দাবি অগ্রাহ্য করলেন না। ফিনল্যাণ্ডকে আলাদা হতে অনুমতি দিলেন—যদিও আলাদা হতে না দিলে ফিনল্যাণ্ড কিছুই করতে পারতো না।

এই পর্যন্ত পড়ে কেউ কেউ হয়তো বুদ্ধিমানের মতো বলবে, কাগজে-কলমে স্বাধীনতা দেওয়া এক কথা আর সত্যি স্বাধীনতা দেওয়া আর এক কথা। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পর জারের আমলের উপনিবেশগুলো কি সত্যই এগিয়েছে? সেখানে কি সত্যই শিল্পের উন্নতি হয়েছে? সত্যই কি সেই দেশগুলির জনসাধারণের জীবন থেকে শোষণের চিহ্ন

চিরদিনের মতো মুছে গেছে ?

এর সোজা স্পষ্ট সবল উত্তর এই : যে-সব দেশ ছিলো জার-শাসিত ও শোষিত গরিব উপনিবেশ, যে দেশগুলিতে শিক্ষার, শিল্পের, স্বাধীনতার বা আনন্দের চিহ্নমাত্র ছিলো না, যে-সব দেশ ছিলো জরা-মৃত্যুর পীঠস্থান, সেই সব দেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে শিল্পে, শিক্ষায় সমৃদ্ধ—গানে হাসিতে মুখর। এবং সে-সব দেশে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই জন্যেই যে সে সব দেশের কর্ণধার হিসেবে কাজ করেছে সমাজতন্ত্র। উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দেওয়া যায়। মাত্র গুটিকয়েক কথার উল্লেখ করেই আমাদের ক্ষান্ত হতে হবে। কিন্তু এই অভাবনীয় পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস তোমরা পড়বে এ আশা আমার রইলো। এই পরিবর্তনের কাহিনী এক বিরাট বিস্ময়ভরা রোমাঞ্চকর কাহিনী।

মধ্য-এশিয়ার ৫টি সোবিয়েত রিপাবলিকের কথা ধরো—উজবেকিস্তান, কাজাকাস্তান, তুর্কমেনিয়া, তাজিকিস্তান, কিরগিজিয়া। এরা সকলেই মাত্র ৪০ বৎসর আগে ছিলো অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশ। আজ এরা প্রত্যেকেই শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। এই পাঁচটি রিপাবলিকের মোট জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ, কিন্তু এই পাঁচটি দেশে আজ যা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয় তা তুরস্ক, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মোট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের তিনগুণ।

এই সব দেশে শুধু যে শিল্পের উন্নতি হয়েছে তা নয়, কৃষির উন্নতিও হয়েছে প্রভূত। কিন্তু সেই কৃষিকার্য হয় আধুনিক

পদ্ধতিতে ট্র্যাকটর ও হারভেষ্টার কম্বাইনের সাহায্যে। এই পাঁচটি রিপাবলিকে ১৯৫২ সালে ১২১০০০ হাজার ট্র্যাকটর ও ২৩০০০ হার্ভেষ্টার কম্বাইন কাজ করেছে। সোবিয়েত উজবেকিস্তানে প্রতি ১৭৬ একর জমির জন্যে একটি ট্র্যাকটর পাওয়া যায় আর ভারতবর্ষে পাওয়া যায় একটি ট্র্যাকটর প্রতি ৩২০০০ হাজার একর জমির জন্যে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই এই সব দেশে হয়েছে এবং বর্তমানে আরও অনেক বড়ো বড়ো জলসেচ ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নাও কিরগিজিয়া। ৪ বৎসরে এই দেশে ২৫০০০ একর মরুভূমিতে খাল কেটে তুলো, গম ও নানা প্রকারের ফল চাষ হচ্ছে।

তুর্কমেনিয়ায় চলেছে এক বিরাট কাজ। ৭০০ মাইল লম্বা এক খাল কেটে এইখানে ৩০ লক্ষ একর জমিতে চাষ-আবাদের বন্দোবস্ত হচ্ছে। এই ৩০ লক্ষ একর জমি এতোদিন ছিলো মরুভূমি।

এই বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জীবনের সমস্ত কিছুর পরিবর্তন।

এই সোবিয়েত রিপাবলিকগুলির প্রতিবেশী পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ। পাকিস্তানে ও ভারতবর্ষে ২০০ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের পর আজও শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। কিন্তু এই পাঁচটি দেশ থেকে মাত্র ৪০ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা প্রায় সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। ১৯১১ সালে ভারতবর্ষে নিরক্ষর লোক ছিলো শতকরা ৯৪ জন আর ১৯১৩ সালে তাজিকিস্তানে নিরক্ষর লোক ছিলো শতকরা ৯৯½ জন। ১৯৪১ সালে ভারত-

বর্ষে নিরক্ষর লোক ছিলো শতকরা ৮৫ জন আর ১৯৩৯ সালে তাজিকিস্তানে নিরক্ষর লোক ছিলো শতকরা ২৮ জন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ৩০ বৎসরে নিরক্ষরতা কমেছে শতকরা ৯ ভাগ আর সমাজতান্ত্রিক সরকারের শাসনে ২৭ বৎসরে কমেছে শতকরা ৮০ ভাগ।

উজবেকিস্তানে নভেম্বর বিপ্লবের আগে শতকরা ৯৭ জন ছিলো নিরক্ষর। আজ সেখানে নিরক্ষরতা নেই। কাজাকাস্তানে বিপ্লবের আগে নিরক্ষর ছিলো শতকরা ৯৮ জন, আজ সেখানে নিরক্ষর শতকরা মাত্র এক জন। তুর্কমেনিয়ায় জারের আমলে মাত্র শতকরা একজন লেখাপড়া করতে পারতো, আজ সেখানে শতকরা ১০০ জনই পারে লেখাপড়া করতে।

শিক্ষার অগ্রগতি কীভাবে হয়েছে নিচের তালিকা থেকে বুঝবে।

জনসংখ্যার তুলনায় পুরো সময় শিক্ষাব্রতীদের সংখ্যা
(১০০০০ হাজারের হিসেব)

তাজিকিস্তান = ৫৮; তুর্কমেনিয়া = ৬০; কিরগিজিয়া = ৬৪; উজবেকিস্তান = ৭১; আজারবাইজান = ৯৩; ইরান = ৩; ভারতবর্ষ = ৯; মিশর = ১২; তুরস্ক—১২; ইংল্যাণ্ড—১৬; সুইডেন—২১; ইটালি—৩২; ডেনমার্ক—৩৪; ফ্রান্স—৩৬।

যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, তেমনি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষ্য করো। ১৯১৪ সালে তাজিকিস্তানে প্রতি ১৩০০০ লোকের একটির আশ্রয় ছিলো হাসপাতালে। ১৯৩৯ সালে প্রতি ৪০৮ জনে ছিলো একজনের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা। ১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষে প্রতি ৩১৩৫ জনে আছে একজনের হাসপাতালে

চিকিৎসার ব্যবস্থা। তাজিকিস্তানে ১৯১৪ সালে প্রতি ১ লক্ষ লোকে একটি ডাক্তার ছিলো। ১৯৩৯ সালে প্রতি ৩৪০০ লোকে ছিলো একটি ডাক্তার। আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালে প্রতি ৬৩০০ লোকে আছে একটি ডাক্তার। যেমন তাজিকিস্তানে তেমনি অন্যান্য রিপাবলিকগুলিতে হয়েছে অনুরূপ উন্নতি। ১৯৫২ সালে উজবেকিস্তানে প্রতি ৮৯৫ জনে ছিলো একজন ডাক্তার, এবং এরই সঙ্গে তুলনা করো মিশরের, যেখানে প্রতি ৪৩৫০ জনে পাওয়া যায় একটি ডাক্তার অথবা ফ্রান্সের, যেখানে প্রতি ১০০০ জনের জন্যে একটি ডাক্তার পাওয়া যায়।

সমাজতন্ত্রের রাজ্যে এই ঐতিহাসিক ও অভাবনীয় অগ্রগতির মূল কথাটি কী? মূল কথাটি এই যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অগ্রগামী জাতি ও পশ্চাদগামী জাতির মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকে ঠিক তার উল্টো। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখেছো যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অগ্রগামী জাতিগুলি পশ্চাদগামী জাতিগুলিকে শোষণ করে প্রতি বছর লুটে নিয়ে যায় কোটি কোটি টাকা। আর সমাজতান্ত্রিক শাসনে অগ্রগামী জাতিগুলির পরিশ্রমের কিছু ফল চালান করে দেওয়া হয় পশ্চাদগামী জাতিগুলির সাহায্যার্থে।

সমাজতন্ত্রের এই বিরাট অগ্রগতি শুধু সোবিয়েত দেশে নয়, প্রত্যেকটি নয়া গণতন্ত্রের দেশে। সমাজতন্ত্র আজ স্বপ্ন নয়, রক্তমাংসে প্রাণবন্ত মূর্ত। তাই লাঞ্ছিত, অপমানিত ও শোষিত কোটি কোটি মানুষ সমাজতন্ত্রের দেশগুলির দিকে তাকিয়ে আছে যেমনভাবে একদিন তাকিয়ে থাকতো ধ্রুবতারার দিকে

অন্ধকার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে যে নাবিক। সমাজতন্ত্রের এই দেশগুলি পৃথিবীর শোষিত জনসাধারণের শুধু আশাস্থলই নয়, তাদের দুর্গ। কারণ শান্তিময় প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র আজ আহ্বান করেছে সাম্রাজ্যবাদকে এই বিশ্বাসে যে, সমাজতন্ত্র তার কাজের আর অগ্রগতির খতিয়ান দিয়েই অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে যে, সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরিয়েছে আর দিন এসেছে স্বাধীনতার, সাম্যের।

এবং যদি মরিয়া হয়ে, সমস্ত আবেদন, নিবেদন, দাবি অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগায় তবে তার দশা হবে ঠিক তেমনি যেমন হয়েছিলো ফ্যাসিষ্ট হিটলারের। হয়তো হিটলারের চেয়েও খারাপ। কারণ হিটলারের অবসানের পরেও সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে রইলো। কিন্তু আবার যদি সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ লাগায় তবে পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মতো সাম্রাজ্যবাদকে লুপ্ত হতে হবে।

যুদ্ধ না শান্তি

১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলো অথবা আহত হয়েছিলো ২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ। যুদ্ধে নষ্ট হয়েছিলো ৩৫০০ কোটি পাউণ্ড অথবা ৪৫৫০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ। নষ্ট হয়েছে ২২ হাজার ৩০০ কোটি পাউণ্ড অথবা ২৮৯৯০০ কোটি টাকা।

হিরোশিমায় যে আণবিক বোমা ফাটানো হয় তাতে তৎক্ষণাৎ মারা যায় ১৭৬০০০ নরনারী ও শিশু। ১০ বর্গমাইলের মধ্যে কিছুই জীবন্ত থাকে না।

হাইড্রোজেন বোমার মারণ-শক্তি এর চেয়ে বেশি। হাজার হাজার মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমা ফাটাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আর তার বিষাক্ত ছাই উড়ে আসছে কলকাতার আকাশে।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ লাগলে পৃথিবী কি বেঁচে থাকবে? এই প্রশ্ন আজ সমস্ত মানুষের সামনে! তৃতীয় মহাযুদ্ধ বন্ধ করা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাত চেপে ধরা—সমস্ত মানুষজাতির সামনে আজ এই সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য।

যুদ্ধে লাভ কার? একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের। সর্বনাশ কার? সমস্ত মানুষ জাতির।

কোরিয়ার যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা কী লাভ করেছে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীরা একাই লাভ করেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। মার্কিনদেশের সাধারণ মানুষ মরেছে কোরিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে এমন কোনো শ্রেণী নেই যারা যুদ্ধ বাধিয়ে নিজেদের আয় অথবা লাভ বাড়াতে পারে অথবা বাড়ানোর আশা রাখতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ঠিক এর উল্টো। সেখানকার একচেটিয়া কোটিপতিরা যুদ্ধের বাজারে আকাশস্পর্শী লাভ করে আর তাই তাদের পক্ষে কোনোরকমে যুদ্ধ লাগিয়ে দেবার চেষ্টার অন্ত নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার সাধারণ মার্কিন প্রাণ

হারিয়েছে। কিন্তু মার্কিন পুজিপতিরা লুটেছে অসম্ভব টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচ বছরে মার্কিন পুজিপতিরা লাভ করে ১০৭০০০ মিলিয়ন ডলার অথবা ৫৩৫০০ কোটি টাকা।

তারপর যুদ্ধ যখন থেমে গেলো, তখন ব্যবসায় এলো মন্দা। এবং আবার যখন তথাকথিত "ঠাণ্ডাযুদ্ধ" আরম্ভ হলো এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গরম যুদ্ধে পরিণত হলো, তখন ব্যবসার মন্দা গেলো কেটে, অর্থাৎ লাভ চললো বেড়ে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে মার্কিন পুঁজিপতিদের যুদ্ধের দরুণ লাভ দাঁড়ালো ১৫৮০০০ মিলিয়ন ডলার অথবা ৭৯০০০ কোটি টাকা।

এই কথা জানলে আমাদের আর বুঝতে কষ্ট হবে না কেন শান্তির নামে মার্কিন পুঁজিপতিরা হায় হায় করে ওঠে—কেন যখনই কোনো শান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই মার্কিনদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য মহলে হতাশা আসে আর ফাটকা বাজারে সংকট দেখা দেয়।

সোবিয়েত রাষ্ট্রে ও সোবিয়েত-সহযোগী রাষ্ট্রগুলিতে যুদ্ধের প্রচার আইনত দণ্ডনীয়। যুদ্ধপ্রচারকে সে-সব দেশের মানুষ মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। শান্তির প্রচার তেমনি আইনগত ভাবে বন্ধ করার চেষ্টা চলেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে, বিশেষ করে মার্কিন দেশে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সব থেকে ক্ষতি হয়েছে কোন দেশের? সোবিয়েত ইউনিয়নের। সোবিয়েত ইউনিয়ন শান্তি চায়। কারণ শান্তি বজায় থাকলে সোবিয়েত ইউনিয়ন এমন অবস্থায় পৌঁছোবে

কয়েক বৎসরের মধ্যে যখন প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজনের সমস্ত জিনিস পাবে সমাজের কাজ থেকে আর সমাজকে দেবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ। এই অবস্থার নামই সাম্যবাদ। আজ সোবিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে যাচ্ছে সাম্যবাদের পথে।

কোন দেশ যুদ্ধের বা দেশরক্ষার খাতে কতো খরচ করে ?

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বাজেটের ৭৭% ভাগ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাজেটের ৩৮% ভাগ

সোবিয়েত ইউনিয়ন বাজেটের ২৪% ভাগ

দেশের বাইরে যুদ্ধঘাঁটি আছে কার ? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। সোবিয়েত ইউনিয়নের দেশের বাইরে কোনো যুদ্ধঘাঁটি আছে কি ? কোনো স্থানেই নেই।

সাম্রাজ্যবাদীরা কি সোবিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তিকে ভয় পায় ? সামরিক শক্তির থেকে সোবিয়েত ইউনিয়নের অর্থ-নৈতিক শক্তিকে ভয় পায় বেশি। সোবিয়েত সমাজতন্ত্রবাদ আজ পৃথিবীর সব থেকে বড়ো ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক শক্তি। সমাজ-তন্ত্রবাদের দেশগুলিতে যে শিল্পের উন্নতি হয়েছে তা ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা কী চায় ? দেশে দেশে ফ্যাসিস্ত সরকার তৈরি করে, উপনিবেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করে সমাজ-তন্ত্রের দেশগুলিকে ধ্বংস করতে।

সোবিয়েত ইউনিয়ন কী চায় ? সোবিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির মূলকথা শান্তি বজায় ও বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বীকার করে স্বাধীনতা ও সমতার ভিত্তিতে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য।

পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা কি সম্ভব ?

নিশ্চয়ই সম্ভব। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের হাতেই রয়েছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। এই সাধারণ মানুষ যদি যুদ্ধবাজদের মতলব বোঝে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্যে সংগ্রাম করে তবে পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করতে পারে এমন কোনো শক্তিই পৃথিবীতে নেই।





১০ খণ্ডের তালিকা

এক ॥ বিজ্ঞান
দুই ॥ ইতিহাস
তিন ॥ ইতিহাস
চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
ছয় ॥ পৃথিবীর খবর
সাত ॥ অর্থনীতি-রাজনীতি
আট ॥ সাহিত্য
নয় ॥ চারুশিল্প
দশ ॥ দর্শন

জানবার কথা শিখতে তো ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাসফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বইগুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই—দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত